কিশলয়

■ ষষ্ঠদশ সংখ্যা-২০২৩

সিএসএস পরিচালিত

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুলের

বার্ষিক প্রকাশনা

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল

স্থাপিত: ১৯৮১ বিদ্যালয় কোড: ৩৭৩৯ ইআইআইএন: ১১৭৪১৮

৮৭, এম. এ. বারী রোড, গল্লামারী, খুলনা।

মোবাইল: ০১৩০৯-১১৭৪১৮, ফোন : ২৪৭৭৭৩৪২২১

E-mail: rphs@cssbd.org

Web: www.rphs.cssbd.org

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মার্চ পাস্ট করছে শিক্ষার্থীরা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ডিসপ্লে প্রদর্শন

অভিনন্দন বার্তা

মহান সৃষ্টিকর্তা, তুমি প্রেমময়, তুমি করুণার সাগর। তুমি আমাদের প্রাণ স্বরূপ, দুঃখবিনাশক, সুখ স্বরূপ। তুমি সমস্ত জগতের প্রকাশক। তাই তোমার নামের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি তোমার করুণা ও ভালোবাসার জন্য।

শিক্ষা মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ এবং উন্নয়নের মানদন্ড। বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। সে ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার বিবেচনায় নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ বহুমুখী শিক্ষাকার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে শিক্ষার মূল ধারায় আওতাভুক্ত করে সরকার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানব সভ্যতার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়ের এক বিরাট মহিমা। সময়ের সঙ্গে জীবন, জীবনের সাথে কর্ম ও অধ্যবসায়- একই বিনিসুতার মালা গাঁথা। জীবনের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন সাধনার, প্রয়োজন একনিষ্ঠ শ্রমের। ছাত্রজীবন পরিণত জীবনের প্রস্তুতি পর্ব। তাই শৈশব থেকেই জীবনের একটি লক্ষ্য থাকা উচিত। তাহলে দিকভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল-এ বার্ষিক মুখপত্র "কিশলয়" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত। ''কিশলয়'' আমাদের আলোকিত মানুষ গড়ার এক সার্থক প্রয়াস, আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতিভার প্রতিফলন। যে তরুণ শিক্ষার্থীদের লেখায় পত্রিকা ধন্য হচ্ছে তারা যেন আগামীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখতে পারে সে কামনা করি। আশা করি আমাদের শিশুদের লেখাগুলো পাঠকদের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেবে শান্তির শুভ বার্তা।

পরিশেষে, বিদ্যালয়ে বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে সেই সকল শুভানুধ্যায়ীদের সিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। "কিশলয়"এর জয়যাত্রা শুভ হোক। সৃষ্টিকর্তা সকলের মঙ্গল করুণ এই শুভ কামনায়-

রেভারেন্ড মার্ক মুন্সী
নির্বাহী পরিচালক
সিএসএস

বাণী

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই পরম করুণাময় সৃষ্টি কর্তাকে, যিনি শিক্ষার আলোয় প্রতিটি শিশু হৃদয়কে আলোকিত করেছেন। যার আশীর্বাদকে আশ্রয় করে প্রিয়ভাজন সকল শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আর স্নেহধন্য শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রকাশিত হচ্ছে "কিশলয়"।

একজন শিক্ষার্থীর প্রাণকেন্দ্র হলো বিদ্যালয়। এখানে এসে প্রথম পাঠ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে নিজেকে গড়ে তোলে একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে। নিজের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে চায় তার কথায়, লেখায়। আর এই অনুকূল পরিবেশে দিনে দিনে সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আমরা সুন্দরের পূজারী। আর এই সুন্দরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হল সাহিত্য। পরিশীলিত শুদ্ধতা শিল্পেরই প্রতীক। স্কুলের বার্ষিক প্রকাশনা "কিশলয়" সৃজনশীল শিল্পেরই প্রতিচ্ছবি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা তোমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চাই, স্বপ্ন দেখাতে চাই, স্বপ্নই পারে একজন মানুষকে সফল করে তুলতে। এই স্বপ্ন একজন মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। আলোকিত, দক্ষ মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। এই লক্ষ্যে আমাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে আমাদের বিভিন্ন রকম অর্জন তারই স্বাক্ষর।

অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। তোমরাই পারবে আগামীকে জয় করতে। এসো আজ সকলে মিলে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হই। এই মন্ত্র সাম্যের মন্ত্র, এই মন্ত্র অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মন্ত্র। জগতের কল্যাণের মন্ত্র। কবির কথায় বলতে হয় "এমন জীবন তুমি করিও গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন"।

শিশুর সহজাত আচরণকে ভালোবাসার ছোঁয়ায় শিক্ষণীয় আচরণের মাধ্যমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের দ্বারা যথার্থ রূপ দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকে পরিবারের সদস্যরা এবং শিক্ষা পরিমন্ডলে শিক্ষকগণ। তাই পরিবারের পাশাপাশি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে একটি ভালো পরিবেশের, ভালোমানের বিদ্যালয়ের কোন বিকল্প নেই। সিএসএস পরিচালিত রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল সেই কাজটি করে চলেছে নিরন্তর। তারই একটি প্রকাশ 'কিশলয়'।

"মুখস্থ নির্ভরতা নয় সৃজনশীলতাই মেধা বিকাশের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার" এই শপথ নিয়ে যে সকল শিক্ষার্থী তাদের মেধা ও মননের স্বাক্ষর রেখেছে তাদের স্বাগত জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনায় পত্রিকাটি সুবিন্যস্ত হয়েছে। যারা লিখতে পারোনি তারা চেষ্টা করো স্ব স্ব ক্ষেত্রে সূর্যের মতো আপন মহিমায় জ্বলে ওঠার। আলোকিত করো কল্যাণকর এ ধরণী। এই শুভ কামনায়-

পরিচালক শিক্ষা
সিএসএস, খুলনা।

বাণী

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল-এর পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। "একমাত্র সুশিক্ষাই একটি জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারে" এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাস রেখে আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়াসে মহানগরী খুলনার সোনাডাঙ্গা থানায় গল্লামারীর প্রাণকেন্দ্রে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল"। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে এই প্রতিষ্ঠান সর্বদা অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে।

বিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা, মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি, নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সার্বক্ষণিক অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্কুলে শতভাগ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

অত্র প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কুলটি প্রতিনিয়তই এগিয়ে চলছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে। অত্যন্ত সফলতার সাথে রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মেধাবৃত্তিসহ এসএসসি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জিপিএ-৫ সহ মেধাবৃত্তি এবং শতভাগ (১০০%) পাশের গৌরব অর্জন করে আসছে।

এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যান্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারে তার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা। সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড, সুশৃঙ্খল বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রশাসন ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর আন্তরিক তত্ত্বাবধানে অভিজাত ও নিরিবিলি পরিবেশে একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এ প্রতিষ্ঠান সর্বদা সচেষ্ট। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারীসহ সকল শিক্ষার্থীর মঙ্গল কামনায় মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

টিটন গাইন
প্রধান শিক্ষক
রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল

স্কুল ম্যানেজিং কমিটি

সভাপতি	:	ডেভিড টমাস গোমেজ
সদস্য সচিব	:	মি. টিটন গাইন
শিক্ষক প্রতিনিধি	:	মিজ মাসুমা সুলতানা
		মো. রিয়াজ-আল-কাদির চৌধুরী
অভিভাবক সদস্য	:	মি. বিভাস কান্তি মন্ডল
		মিজ মাহমুদা খানম
		মিজ রহিমা খাতুন

কিশলয় সম্পাদনা পর্ষদ

ফেরদৌসি নাওয়ার	(দশম শ্রেণি)
হাবিবা সুলতানা শান্তা	(দশম শ্রেণি)
ফাবিহা লামিশা	(দশম শ্রেণি)
রুবিনা আক্তার	(নবম শ্রেণি)
তরিকুল ইসলাম	(নবম শ্রেণি)
নাহিদ হাসান	(নবম শ্রেণি)
অথৈ দাস	(নবম শ্রেণি)

কিশলয় সমন্বয় কমিটি

তনুশ্রী বসু (কো-অর্ডিনেটর)
স্বাগতা রাণী কুণ্ডু
চম্পক রঞ্জন বিশ্বাস
ছন্দা দেবনাথ
নিত্যানন্দ চক্রবর্তী
মো: নাদিম রায়হান
মো: আরিফুল ইসলাম

এক নজরে ২০০১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুলে প্রধান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন ও করছেন –

- মি. ভূপাল চন্দ্র শাঁখারী
- মিজ মায়া দেবী সরকার
- মি. রণজিৎ কুমার মল্লিক
- মি. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস
- মি. শীতল কুমার সরকার
- মিজ সোহানা ইসরাত (ভারপ্রাপ্ত)
- মি. আইবন ফিলিপ হালদার
- মি. রথীন্দ্র নাথ সরদার (ভারপ্রাপ্ত)
- ইব্রাহীম খলিল
- নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (ভারপ্রাপ্ত)
- টিটন গাইন (বর্তমান)

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুলে কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলী

টিটন গাইন
প্রধান শিক্ষক

এস কে ওমর ফারুক
সহকারী প্রধান শিক্ষক

দূর্গা রাণী সাহা
সহকারী শিক্ষক

স্বাগতা রাণী কুণ্ডু
সহকারী শিক্ষক

রথীন্দ্র নাথ সরদার
সহকারী শিক্ষক

পিউ সমদ্দার
সহকারী শিক্ষক

রঞ্জন কুমার সরকার
সহকারী শিক্ষক

রোকসানা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

হোসনে আরা পারভীন
সহকারী শিক্ষক

মিন্টুলাল হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক

মিটুন কুমার বর্মন
সহকারী শিক্ষক

দোলন চাঁপা মণ্ডল
সহকারী শিক্ষক

মাসুমা সুলতানা
সহকারী শিক্ষক

চম্পক রঞ্জন বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক

রিয়াজ-আল-কাদির চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

ছন্দা দেবনাথ
সহকারী শিক্ষক

আবু বক্কার সিদ্দীক
সহকারী শিক্ষক

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী
সহকারী শিক্ষক

সামিনা সুলতানা সুমি
সহকারী শিক্ষক

মাসুমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুলে কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলী

বিনায়ক মন্ডল
সহকারী শিক্ষক

শ্যামসুন্দর চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক

শিমুল কুন্ডু
সহকারী শিক্ষক

তনুশ্রী বসু
সহকারী শিক্ষক

মো. নাদিম রায়হান
সহকারী শিক্ষক

মিঠুন কুমার জোদ্দার
সহকারী শিক্ষক

লিংকন ঢালী
সহকারী শিক্ষক

এস. এম. নুরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

ফিলোমিনা নূপুর ব্যারেল
সহকারী শিক্ষক

মো. আরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

রবীন্দ্রনাথ ঢালী
সহকারী শিক্ষক

শক্তি দত্ত
সহকারী শিক্ষক

নাঈমা আক্তার তন্বী
শিক্ষক সহকারী (খন্ডকালীন)

মিথিলা বিশ্বাস
শিক্ষক সহকারী (খন্ডকালীন)

তিথি সেন
শিক্ষক সহকারী (খন্ডকালীন)

মুক্তা মণ্ডল
শিক্ষক সহকারী (খন্ডকালীন)

সুমাইয়া আক্তার
শিক্ষক সহকারী (খন্ডকালীন)

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুলে কর্মরত অফিস কর্মচারীবৃন্দ

বনানী আফরোজা
লাইব্রেরিয়ান কাম-সহকারী শিক্ষক

মো. ইমরান হোসেন
সহকারী হিসাবরক্ষক
কাম স্টোর এবং রেকর্ড কিপার

যাকোব গমেজ
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

নিলার্শ মুখটী
পিয়ন

তারা বেগম
আয়া কাম ক্লিনার

ইন্দ্রজিত সরকার
পিওন কাম ক্লিনার

গোপাল কুমার দে
পিওন কাম ক্লিনার

জাহানারা বেগম
আয়া কাম ক্লিনার

আল আমিন গাজী
ড্রাইভার

এসএসসি এ+ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ ২০২২

আদ্রিতা মণ্ডল

পূজা রায়

মাগদেলেনা তুলনা বিশ্বাস

আফসানা আক্তার মুন্নি

খাদিজা রহমান

মালিহা ইরিন

জুম্মি সাদিয়া

হাবিবা সুলতানা

মৌরিন জাহান

মোসা: রোকাইয়া ইসলাম

নাসরিন সুলতানা মৌসুমী

লামিয়া ইয়াসমিন স্নেহা

এলড্রিন ধ্রুব গোমেজ

প্রীতম জোয়াদ্দার

মো: তানভির হোসেন

আল মুঈদ সরদার

রাইয়ান হোসেন

জি.এম. আবিদ হাসান আপন

মুয়াজ আমিন

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফিরোজ

মোঃ মাহিম আলী শেখ

এসএসসি ও পিএসসি বৃত্তি প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ ২০২২

মালিহা তাবাচ্ছুম
এসএসসি

সুজানা মেহেজাবিন
এসএসসি

ইসরাত জাহান ঐশী
পিএসসি

হুমাইরা ফেরদৌস
পিএসসি

অর্ঘ সাহা
পিএসসি

হিমেল মুন্সী
পিএসসি

বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন সমাবেশ

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	মা	১৪
০২	স্বাধীনতা	১৪
০৩	শরবতের সুনাম	১৪
০৪	বুকের বাংলা ভাষা	১৪
০৫	অথৈ সাগর	১৪
০৬	মা আমার	১৪
০৭	বঙ্গবন্ধু	১৪
০৮	আজগুবি স্বপ্ন	১৫
০৯	২১শে ফেব্রুয়ারি	১৫
১০	মাতৃভাষা দিবসের কবিতা	১৫
১১	একাত্তর	১৫
১২	উনিশে মে আর ২১শে ফেব্রুয়ারি	১৬
১৩	মাতৃভাষা বাংলা	১৬
১৪	রক্ত	১৬
১৫	একুশের কথা	১৬
১৬	বাংলা ভাইয়ের ইতিহাস	১৬
১৭	স্বাধীনতা	১৭
১৮	Death	১৭
১৯	শহীদ স্মরণে	১৭
২০	একুশ তুমি	১৭
২১	তাল বেতাল	১৭
২২	মাতৃভাষা	১৭
২৩	ভাষা শহিদ অহিউল্লাহ	১৮
২৪	একুশের গল্প	১৮
২৫	অভিশপ্ত পুতুল	১৯
২৬	২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, ৮ই ফাল্গুন	১৯
২৭	একটি শিক্ষণীয় গল্প	২০
২৮	অশরীরী	২০
২৯	একুশের রক্ত স্রোত	২১
৩০	মুক্তিযুদ্ধ	২২
৩১	একুশে ফেব্রুয়ারি	২৩
৩২	একজন বীরের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার গল্প	২৩
৩৩	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	২৪
৩৪	রসায়নের রস আহরণ	২৫
৩৫	জীবনের রঙে গণিত	২৬
৩৬	ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইংলিশ	৩১
৩৭	ধাঁধা	৩৩

স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম

২০২৩ সালের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

২০২৩ সালের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

সিএসএস প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন

সিএসএস প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন

স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা প্রস্তুতকরণ

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

শিক্ষক-অভিভাবক মত বিনিময় সভা

বার্ষিক বনভোজন ২০২৩ উদ্‌যাপন

বার্ষিক বনভোজন ২০২৩ উদ্‌যাপন

স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম

অন্তঃবিদ্যালয় হ্যান্ডবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সফর-২০২৩

শিক্ষা সফর-২০২৩

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম

নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম

নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম

গার্হস্থ্য প্র্যাক্টিক্যাল

গার্হস্থ্য প্র্যাক্টিক্যাল

স্কুলের বিভিন্ন অর্জন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩-এ A+ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীর একাংশ।

মা

রওদা চৌধুরী
পঞ্চম শ্রেণি

মা মানে ভালোবাসা
মা মানে বিজয়ী
মা মানে বাড়িতে সবচেয়ে মমতাময়ী
মা হলো পরিবারে সবচেয়ে সেরা
মা হলো ভয় যখন করে জেরা।
আমি ভুল করলে মা দেয় বকা
তখন হবে মুশকিল, মায়ের সামনে থাকা।
এত কিছু করলেও মনে রেখ ভাই
মায়ের চেয়ে আপন কেউ
এই ভুবনে নাই।

স্বাধীনতা

অথৈ দাস
নবম শ্রেণি

স্বাধীনতা বলতে আমি
শেখ মুজিবকে বুঝি।
স্বাধীনতার মাসটি এলে,
শেখ মুজিবকেই খুঁজি।
কোথায় পাব জাতির জনক
সেই মানুষ
যার ডাকেতে সাড়া দিত
ছোট-বড় সব মানুষ।
যার বুকেতে সাহস ছিল
বিশাল পাহাড় প্রমাণ।
যার ভয়েতে কাঁপতো
পাকিস্তানি কামান।
কোথায় এখন সেই মানুষ
এত সাহস যাঁর
দুঃসময়ে পৃথিবীতে,
তাঁকেই ভীষণ দরকার।
হারিয়ে গেছে জাতির জনক
তবুও মনে রেখেছি
বাংলাদেশের মানচিত্রে
তাঁর ছবিটি এঁকেছি।

শরবতের সুনাম

রওদা চৌধুরী
পঞ্চম শ্রেণি

শরবত তৈরী করতে
লেবু লাগে হায়
পরিবারের সবাই মিলে
মজা করে খাই।
এই শরবত তৈরী করতে
লেবু-চিনি লাগে ভাই
গরমের দিনে এই শরবতের
কোন তুলনা নাই।

বুকের বাংলা ভাষা

রুবিনা আক্তার
নবম শ্রেণি

যত দূরেই যাচ্ছি তোদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি
তোরা আমার সঙ্গ ছাড়িস না
আঁচল পেতে আছেন বসে ঐ আমাদের মা,
একজোটে ঐ দুঃখিনীটির ঘরের দাওয়ায় যাবো
খুঁদকুড়ো যা পাই, সবাই মিলে খাবো
মাটি এখন জংলা
ঐখানে ঠায় আছেন বসে দুঃখিনী মা বাংলা,

অথৈ সাগর

অথৈ দাস
নবম শ্রেণি

উৎকলিত অথৈ সাগর
মাঝি একা টানে দাঁড় উঠিবে ঐ তীরে।
বাহে তরী ঝরায়ে ঘাম উৎকণ্ঠা হৃদয়ে
বহু আশা তারা যাবে ঐ তীরে
অথৈ সাগরে উর্মির দংশনে
তরী তার যায় যায়
মাঝি কেঁদে বলে,
আর বুঝি কোনো ক্ষমা নয়।

মা আমার

অথৈ দাস
নবম শ্রেণি

মা আমার মা
বড়ই অভাগিনী।
সারাটি জীবন ধরে সে যে
ফেলেছে চোখের পানি।
বুকে তাহার দারুণ জ্বালা
দিয়েছে নিয়তি
তাইতো সে যে কেঁদে ফেরে
দিবা রাতি
আশা তাহার ছিলো যত
হারিয়েছে কালে কালে।
মা আমার এখন শুধু
বেড়ায় চোখের জলে।
স্বপ্ন তাহার অনেক ছিল
নয়ন মাঝে গাঁথা।
স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন রইলো
পূর্ণ হলো না তা।

বঙ্গবন্ধু

তরিকুল ইসলাম
নবম শ্রেণি

তুমি বন্দী ছিলে বলেই
আমরা দেয়াল ভেঙেছি
তুমি সাহসী ছিলে বলেই
আমরা রক্তে রেঙেছি।
তুমি মুক্তির ডাক দিয়েছো বলেই
আমরা সাহস পেয়েছি
তুমি সংগ্রাম করেছো বলেই
আমরা বিজয় পেয়েছি।
তুমি বলেছো বলেই
আমরা মুক্তির গান পেয়েছি
তুমি এসেছো বলেই
আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

আজগুবি স্বপ্ন

শেখ ফেরদৌসী নাওয়ার
দশম শ্রেণি

শীতের দিনের এক সকালে অঙ্ক করতে বসে,
"অঙ্ক করে ইংরেজিটা পড়তে হবে শেষে।"
মায়ের কথায় অঙ্ক করে ইংরেজি বই খুলে
ওমা! এ যে ইংরেজি নয়, যাচ্ছি যে সব ভুলে।
স্পষ্ট দেখছি প্রচ্ছদটা ইংরেজি বইয়েরই
ভেতরে আবার আজগুবি সব ছবির ছড়াছড়ি।
"অবাক হচ্ছো?" কে বলল আশেপাশে দেখি'
"বইয়ের ভেতর থেকে বলছি, এই যে আমি, খুকি।"
বইয়ের ছবি কথা বলে! চক্ষু চড়ক গাছ,
কোন দিকে যে লাল সূর্য উদয় হয়েছে আজ!
চোখ ডললাম, হয়তো ঘুমের রেশটা এখনো কাটেনি,
তারপরেও দেখলাম যে অদ্ভুত কাজ মেটেনি।
বইয়ের ভেতর আজব জন্তু বিড়াল মাথার গরু
আমায় টেনে বইয়ের ভেতর নিল, দেখি জায়গাটা মরু।
জ্ঞান হারাবার জোগাড় হলাম, মরুতে পেঙ্গুইন!
সাথে আছে মেরু ভাল্লুক, একা সঙ্গীহীন।
আমায় নিয়ে ছুটল সেই আজব রকম প্রাণী
অ্যামাজনের জঙ্গলেতে ফেললো আমায় আনি।
সেথায় কাছিম জোরসে ছোটে, খরগোশ ধীরে ধীরে,
তাদের কাজে অবাক হয়ে, গেলাম নদীর তীরে
খরগোশ গেল পানির তলায়, মাছেরা সব ডাঙায়,
বাঘ-হরিণে বলছে কথা, অবাক করে আমায়।
বাঘে নাকি খাচ্ছে পাতা, হরিণ খাচ্ছে মাংস,
হচ্ছে গল্প, ওটা নাকি পরস্পরার অংশ।
হঠাৎ হরিণ আমায় দেখে ঘাউ করে ওঠে,
আমার দিকে আসছে তেড়ে, মরছি আমি ছুটে।
পা হড়কে গেলাম পড়ে, মারল হরিণ লাথি
তড়াক করে উঠে আমি দৌড় দিই রাতারাতি।
আবার পা টা হড়কে গেল, এবার পড়লাম জলে
জলে পড়লে ব্যাথা লগে! কীযে হয় তাহলে।
চোখ মেলে দেখি কোথায় এলাম! এ যে আমার বাড়ি,
পালং থেকে গিয়েছি পড়ে, দরদ হচ্ছে ভারি।
তবে কি দেখেছি আষাঢ়ে স্বপ্ন? সত্যি কিছুই নয়?
টেবিলে থাকা ইংরেজি বই, খুলে তো দেখতে হয়।
ইংরেজি বইয়ের লেখাগুলো সেখানেতেই আছে,
স্বপ্ন দেখে শুধু শুধু ভয় পেয়েছি পাছে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি

ইমা আক্তার রাত্রি
দশম শ্রেণি

রাত ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা হলো জারি
২১শে ফেব্রুয়ারি আসলে পরে বাঙালির বুকের রক্ত ঝরে
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ভাষার লড়াই বুকে সবার
স্বাধীন ভাষা পেতে গেলে ছুটতে হবে প্রাণকে ছেড়ে
ছাড়তে হবে প্রাণের মায়া ভাষা হবে সবার ছায়া
প্রাণ দিয়েছে যারা ভাষার জন্য ধন্য আমরা তাদের জন্য
অনুসারী তাদের হয়ে সারা জীবন থাকবো রয়ে।

মাতৃভাষা দিবসের কবিতা

শাহারিয়া
নবম শ্রেণি

মনে পড়ে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি
লাখো বাঙালির কাতর চিত্তে করুণ আহাজারি।
একুশ তুমি বাংলার মানুষের হৃদয় ভরা আশা
তোমার কারণে পেয়েছি আজ কাঙ্ক্ষিত মাতৃভাষা।
রক্ত ঝরালো সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার
বায়ান্নর সেই করুণ কাহিনী মনে পড়ে বারবার।
স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে সেই বিষণ্ন দিনের কথা
যত ভাবি ততই যেন মনে পাই বড় ব্যথা।
প্রতিবাদে মুখর দৃঢ় চিত্তে বাংলার দামাল ছেলে
আরো আছে কত শ্রমিক, যুবক, নারী, কৃষক ও জেলে।
অবশেষে দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলো সরকার
বাঙালিরা পেল মাতৃভাষার সোনালী দিবাকর।
রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি আজ কাঙ্ক্ষিত মাতৃভাষা
একুশ তুমি চির অমর তুমি আমাদের ভালোবাসা।

একাত্তর

নাহিদ হাসান
নবম শ্রেণি

একাত্তর তুমি এক মর্মান্তিক স্মৃতি
একাত্তর তুমি ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ
একাত্তর তুমি দশ লক্ষ নারীর সম্মান
একাত্তর তুমি মায়ের কোল করেছ খালি
একাত্তর তুমি এনেছো মুখের বাণী
একাত্তর তুমি শেখ মুজিবের নাম
একাত্তর তুমি ভাই হারা বোনের স্মৃতি
একাত্তর তুমি স্বাধীনতার নীতি
একাত্তর তুমি স্বাধীন দেশের প্রতীক
তোমারই জন্য বাংলাদেশ পেয়েছে
বিশ্ব দরবারে এক নাম।

উনিশে মে আর ২১শে ফেব্রুয়ারি

শারমিন আক্তার তানজিলা
নবম শ্রেণি

বুকের রক্ত মুখে তুলে যারা মরে
ওপারে ঢাকায় এপারের শিলচরে
তারা ভালোবাসে বাংলা ভাষায় জুড়ি
প্রাণের পুণ্যে হয়ে ওঠে জমকালো
সে আলোয় দেয় মারের সাগর পাড়ি
উনিশে মে আর ২১শে ফেব্রুয়ারি
সে আলো টলে না মৃত্যুর কালো ঝড়ে
তর্জনি তুলে জেগে থাকে ঘরে ঘরে
দুলিয়ে গলায় তাজা বুলেটের মালা
হাজার মুখের মিছিলে দিয়েছে পাড়ি
উনিশে মে আর ২১শে ফেব্রুয়ারি।

মাতৃভাষা বাংলা

মাহিয়া ইসলাম দিয়া
নবম শ্রেণি

আমাদের এই বাংলা ভাষা
কতো মধুর তাই না
কোন কিছু পেতে হলে
সহজ সে তা হয় না
পাকিস্তানীরা বলেছিলো
এই মধুর ভাষা আমাদের থাকবে না
বাংলার দামাল ছেলেরা বলেছিলো
তারা এই মায়ের মুখের ভাষা ছাড়বে না।
পাকিস্তানিরা বলেছিলো এটা করলে চলবে না
তাইতো বাংলার দামাল ছেলেরা
কোন কিছুর পরোয়া না করে শুরু করলো
২১শে ফেব্রুয়ারি বিরাট আন্দোলন
আর এই আন্দোলনে প্রাণ দিলো
কতো মায়ের বুকের সন্তান
যেটা মোটেও সহজ ছিলো না
কতো শহিদের জীবন ত্যাগের মাধ্যমে
আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষা।

রক্ত

সানজিদা সুলতানা
দশম শ্রেণি

মানুষের মধ্যে রঙের ভেদাভেদ
তা তো জানো সবাই তোমরা
কিন্তু দেহের ভিতরে যে তাদের
এক রঙ নিয়ে বাস করি আমরা।
দেহের ভিতরের রঙ যে একই
তাও তো মানুষ তা মানে না।
মরার পরে যাবে যে কোথায়
তাও তো কেউ তা জানে না
কোষে, ফুসফুসে অক্সিজেনের
সরবরাহ করি আমরা
আমরা যদি কাজ না করি
তাহলে মারা পড়বে তো তোমরা।

একুশের কথা

জিহাদ হাসান
নবম শ্রেণি

বাংলাদেশের সোনার ছেলে
ভাষা শহিদের দল
জীবন দিয়ে এনে দিল
বাংলা ভাষার ফল।
তাদের দানে আজকে মোরা
স্বাধীনভাবে বাংলা বলি
সেই সোনাদের ত্যাগের কথা
কেমন করে ভুলি।
ফেব্রুয়ারি, ফেব্রুয়ারি
বাংলা ভাষার মাস
বাংলা আমার মাতৃভাষা
মিটাই মনের আশ
রফিক, সালাম, বরকত
আরো হাজার বীর সন্তান
করলো ভাষার মান রক্ষে
বিলিয়ে আপন পরান
যাদের রক্তে রাঙালো একুশ
ওরা যে অম্লান
ধন্য আমার মাতৃভাষা
ধন্য ওদের প্রাণ।

বাংলা ভাইয়ের ইতিহাস

মো.রাশিদ শাহরিয়ার
নবম শ্রেণি

একুশে ফেব্রুয়ারি
বাংলার হাতে খড়ি
বাংলা মায়ের জন্য
দিনটি যেমন ধন্য
তেমন আছে দুঃখ
তারা ভালোবাসে বাংলা মাকে
বাংলা ভাষা না থাকলে
বাংলা মায়ের অস্তিত্ব কি থাকে?
একি সন্তান মেনে নিতে পারে
তারা যে দামাল, তারা যে যোদ্ধা
একি জানে না পাকিস্তানিরা
তারা করে গুলি
রুখতে পারিনি বাংলার বুলি
ভায়েরা বিসর্জন দিল জীবন
মায়ের খালি হলো কোল
বোনের চোখের জলে ভিজল আঁচল
এ ইতিহাস বাংলার বুকে থাকবে গাঁথা
এ ইতিহাস রক্তে লেখা
এ ইতিহাস বাঙালির
তারা যে বিজয়ী বীর
মুক্ত বাংলা যুক্ত কর
সোনার বাংলা ধন্য করো
মুক্ত বাংলা সবার আছে
যুক্ত করো মোদের আশা
বাংলা ভাষা পরানের ভাষা
ধন্য আমার
বাংলার মাটি
যেথায় জন্মেছে
লাখো বীর সন্তান
সালাম জানাই
৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি।

স্বাধীনতা

জান্নাতুল ফেরদৌস
নবম শ্রেণি

স্বাধীনতা!
তুমি কি একাত্তরের যুদ্ধ
স্বাধীনতা!
তুমি কি পুত্রহারা মায়ের দুঃখ?
স্বাধীনতা!
তুমি কি বিধবা রমনীর কান্না?
কিংবা নববধুর সজল চাহনী?
স্বাধীনতা!
তুমি কি পিতাহারা পুত্রের শোক?
নাকি টগবগে পুত্রহারা অশ্রু
সিক্ত চোখ?
স্বাধীনতা!
তুমি কি ত্রিশ লক্ষ বীর শহীদের
রক্ত স্নান বাংলাদেশ?

Death

SK. Omar Faruque
Asst. Head Teacher
RPHS

One day I'll leave
and you can't believe.
That I'm dead
lying on that iron bed.
I knew, it'd come
fading away luxury and charm.
I'll be of unseen.
Don't find me and be in vain.
Pardon me. Oh! world.
I'm here. Oh! eternal herald.
I'm exhausting, it's death.
Death of life, not life after death.
The iron bed on shoulder
towards grave bed of here after.
Darkness amidst mud.
Forget me but don't leave grave yard.

শহীদ স্মরণে

লিংকন ঢালী
সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি)

আজ কতদিন হলো
তোকে দেখি না খোকা
কেনো এত অভিমান রে তোর
খেয়ে একটু বকা।
সেই যে গেলি
আর ফিরে এলি না
অপেক্ষা! কবে বলবি এসে
এইতো আমি এসেছি মা।
কত দিন হলো
তোর মুখে শুনি না মা ডাকটি আর
অসহ্য যন্ত্রণা আর কষ্টে
ফেটে যায় বুকটি আমার।
সূর্যাস্তের পানে চেয়ে থাকি
কবে! কবে! তুই আসবি
কবে এসে মা বলে
আমায় জড়িয়ে ধরে ভালোবাসবি?
তুমি আর অপেক্ষা করো না মা
ওরা আমাকে আসতে দেবে না
ওরা তোমার কোলে মাথা রেখে
আমাকে আর ঘুমাতে দেবে না
ওরা আমার তোমার মিষ্টি মাখা মুখ
আমাকে দেখতে দেবে না
মাগো!
আমার কথা যখন
পড়বে তোমার মনে
তুমি চেয়ে থেকো
ঐ শহীদ মিনারের পানে।

একুশ তুমি

এ কে রাফি
নবম শ্রেণি

একুশ তুমি আসবে ফিরে
প্রতি বছর ঘুরে
একুশ তুমি মায়ের ভাষা
থাকবে আমায় ঘিরে।
একুশ তুমি রক্ত গোলাপ
সুখ সমৃদ্ধ আশা
একুশ তুমি জীবন আমার
ছোট্ট ভালোবাসা।
একুশ তুমি আশার আলো
গর্ব করা ধন
একুশ তোমায় দেবো মোরা
উজাড় করে মন।

তাল বেতাল

এস কে ওমর ফারুক
সহকারী প্রধান শিক্ষক
আরপিএইচএস

তালতলাতে তালের কাঁদি
পড়ল যখন ছিঁড়ে।
চমকে উঠে বাইকের পিছে
তাকাই আমি ফিরে।
নড়বড়ে বাঁধন দিয়েছিলাম
তাইতো গেছে খুলে।
সম্মুখে মোর দু'চোখ ছিল
তাকাইনি পিছে ভুলে।
কাঁদি থেকে তাল গুলো মোর
রাস্তায় একাকার।
বেতাল পাবলিক দৌঁড়ে এসে
যে ধরবে তাল তার।
বেতাল পাবলিক রাস্তায় এবার
বাঁধলো ভীষণ জ্যাম।
তাল নিবি যা নিয়ে যা
এবার তোরা থাম!
কোথা থেকে হঠাৎ রোড পুলিশ
এই সেরেছে কাম!
সার্জেন্ট হাঁকায় জ্যাম বাঁধিয়েছে
বল আগে তার নাম।
তাল হিস্ট্রি বললাম আমি
একটু আধটু ভয়ে।
তাল দিয়েছে এক শুভাকাঙ্ক্ষি
অনেক অনেক বিনয়ে।

বি.দ্রঃ তালতলা যশোর জেলার একটি লোকাল বাস স্ট্যান্ড।

মাতৃভাষা

জারিন আহমেদ
নবম শ্রেণি

দুই বছরের ছোট্ট ছেলেটা বিড় বিড় করে কথা বলে
কেউ না বুঝলেও মা ঠিক বুঝে নেয়
ছোট বোকা মেয়েটার কি যেন বলতে চায়
কেউ না বুঝলেও মা ঠিক বুঝে নেয়।
পোষা পাখিটি যখন কিছু বলে
তাও মা বুঝে নেয়
মায়ের শেখানো প্রথম বুলিটা যে
আমার মাতৃভাষা।
তাই তো না বলতেই মা বুঝে নেয়
এই যে আমার মায়ের প্রাণের ভাষা
আ মরি বাংলাভাষা ॥

ভাষা শহিদ অহিউল্লাহ

অর্নিমা আজাদ (ফাল্গুনী)
নবম শ্রেণি (ব্যব. শিক্ষা বিভাগ)

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ফেব্রুয়ারি একটি জ্বলজ্বলে আত্মত্যাগ, সাহস ও গৌরবের স্মৃতি বহনকারী মাস। বাংলা ভাষার সেই আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন ৯ বছর বয়সী ছোট্ট অহিউল্লাহ। যার পরিচয় আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। পুরান ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দা রাজমিস্ত্রী হাবিবুর রহমানের একমাত্র সন্তান দূরন্ত স্বভাবের অহিউল্লাহর প্রিয় শখ ছিল ছবি আঁকা। লোকমুখে শোনা যায়, অহিউল্লাহর শার্টের বুক পকেটে সবসময় থাকতো ছবি আঁকার পেন্সিল ও কাগজ। তাঁর বাবা তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। তাই শত দরিদ্রতার মধ্যেও ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন স্কুলে। জানা যায়, অহিউল্লাহ সে সময় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি, আগের দিনের নির্মম হত্যাকান্ডের পর সারাদেশে চলছে পাকিস্তানি পুলিশের টহল। সেদিন চারিদিকে ছিল এক বিরাজমান আতঙ্ক। শহিদ রফিক, শফিক, জব্বারদের স্মরণে করা ছাত্রদের মিছিলে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল সারাদেশসহ পুরান ঢাকার এলাকাগুলো। পাকিস্তানি সরকারের পুলিশ, ছাত্র জনতার সেই মিছিল প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে সময় ওই এলাকায় মানসী সিনেমার কাছে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন অহিউল্লাহ। তার সামনেই এসে থামে পুলিশের গাড়ি। গাড়িটির ছবি আঁকা শুরু করা মাত্র ছাত্রদের মিছিলটি তার ও গাড়ির কাছাকাছি চলে আসে। কিছু না বুঝে অবুঝ অহিউল্লাহ যোগ দেন মিছিলে। মিছিলটি এগোতেই আকস্মিক গুলি ছোড়ে পুলিশ। শহিদ হন ৯ বছর বয়সী দুরন্ত ছেলে অহিউল্লাহ সহ অনেকে।

একুশের গল্প

নুসরাত জাহান আলভী
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)

স্কুল ছুটির পর বাড়ি পৌঁছেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সোমা। কারণ, তার বড় চাচা তার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। ঠিক তখনই সোমার মনে পড়ে যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের কথা। সোমা তার চাচার কাছে জানতে চায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? চাচা বলেন, তাহলে শোন। আজ তোকে একটা গল্প বলি, একুশের গল্প। এ কোনো গল্প নয়। এ আমাদের গৌরবময় ইতিহাস। ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হওয়ার পর আমরা পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাই। আমরা বাঙ্গালিরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা সর্বদাই আমাদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। তার প্রথম আঘাত হানে আমাদের মাতৃভাষার উপর। আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায়। সোমা জানতে চায়, বাঙ্গালিরা সেদিন কী করেছিলো চাচা? চাচা বলেন, সে দিনটি ছিলো ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখ। বাঙ্গালিরা তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঠিক সেদিন রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ বাঙ্গালির সূর্যসন্তানরা এই কঠোর আইন ভেঙ্গে রাজপথে নেমে আসে। স্লোগান তোলে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"

পাকিস্তান সরকার এই আন্দোলনকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য পুলিশদের লাঠিচার্জ করার হুকুম দেয়। পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয় প্রতিবাদী ছাত্রদের কোমল বুক। কৃষ্ণচূড়ার লাল পাপড়ির মতো লোহিত হয়ে যায় রাজপথ। মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে ভাষার জন্য সেদিন প্রাণ দেয় বীর তরুণেরা। তারপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পুরো দেশ। এই চাপে পড়ে অবশেষে পাকিস্তানিরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত দেয়।

সোমা অবাক হয়, সে বলে, ভাষার জন্য এতো কষ্ট সহ্য করেছে আমাদের ভাষা শহিদরা। চাচা বলেন, পৃথিবীতে একমাত্র বাঙ্গালিরাই ভাষার জন্য রক্ত ঝরিয়েছে। তাইতো ইউনেস্কো বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো বিশ্বে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে পালন করা হয়।

সেদিন একুশ ফেব্রুয়ারিতে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে যায় সোমা। বাগান থেকে সতেজ ফুল তুলে তৈরি করে ফুলের তোড়া। তারপর প্রভাত ফেরিতে যোগ দেয় সোমা। হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। সবার হাতে ফুলের তোড়া আর পুষ্পস্তবক। খালি পায়ে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের দিকে। এরপর ফুল প্রদান করে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে সবাই সমস্বরে গেয়ে ওঠে-

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি"।

অভিশপ্ত পুতুল

জান্নাতুল মহিমা
ষষ্ঠ শ্রেণি

গ্রামের নাম ফুল বাগান। সেই গ্রামের এক কোণে বাস করত ৭ জন মহিলা। তাদের সবার মাত্র একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল তাদের দত্তক নেওয়া বাচ্চা। মেয়েটির নাম ছিল ফাতেমা। ফাতেমার একটি বন্ধু ছিল তার নাম তামান্না। তাদের দুই জনের বয়স ছিল ৯ বছর। তারা দুইজন সারাদিন একসাথে থাকত। একসাথে খেলত এবং একসাথে ঘুমাতো। সে দিন তারা যখন খেলছিল, খেলতে খেলতে তারা একটি পুরানো বাড়ির সামনে এসে পৌঁছাল। তারা বাড়ির ভিতর ঢুকলো। তারপর তারা খেলতে শুরু করল। অনেক সময় খেলার পর তারা বাড়ি ফিরে আসলো। তারা পরদিন যখন তারা খেলছিল তখন তাদের মাথায় সেই পুরানো বাড়ি নিয়ে অনেক প্রশ্ন মাথায় আসে। তারা দুইজন তখন সেই পুরানো বাড়িতে যাই এবং খেলতে থাকে। কিছুদিন তারা পুরানো বাড়িতে খেলে। একদিন যখন তারা খেলছিল তখন তারা একটি মেয়ের কথা শুনতে পাই। মেয়েটি তাদের কাছে অনেক প্রশ্ন করে। যেমনঃ তোমরা কে? কোথা থেকে এসেছে? কী করতে এসেছো? তারা দুইজন তখন একটু ভয় পেল! তারা আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। তারা আরো ভয় পেলো। তারা যখন সামনে তাকালো তখন তারা দেখল। তাদের সামনে একটি জীবন্ত পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। তারা খুব ভয় পেলো। পুতুল তাদের ভয় পেতে দেখে বলল-তোমরা ভয় পেয়োনা। আমি তোমাদের কিছু করবো না। কথা দিলাম। তখন তাদের একটু ভয় কমলো। তারা বলল- ঠিক আছে। আজ থেকে তুমি আমাদের বন্ধু। এরপর তারা প্রায় একসাথে খেলত। একদিন তারা যখন একসাথে খেলছিল হঠাৎ তাদের দুইজনের ওপর পুতুলটি আক্রমন করে এবং সে তার কথা ভঙ্গ করে। আসলে পুতুলটি ছিল অভিশপ্ত। তারা দুইজন কোনোরকম প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরল। তারা সেই ৭ জন মহিলাকে সব কথা বলল। সেই মহিলারা তখন বলল-ওই বাড়িতে যারা যায় তারা আর কোনো দিন ফিরে আসে না। তারপর থেকে আর কোনোদিন ফাতেমা আর তামান্না ওই পুরানো বাড়িতে যায় না। এমনকি এই ঘটনা শোনার পর গ্রামের কোনো লোক ওই বাড়িতে যায় না।

২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, ৮ই ফাল্গুন

আব্দুর রাফি
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)

আমি একজন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। আর আমার ইতিহাস ও খুব একটা পছন্দ নয়। তবুও আমি আমার শিক্ষকদের জোরা-জুরির জন্যে এটি লিখলাম–শুরুতে একটা ইতিহাস নিয়েই বলা যাক। আমরা বর্তমানে যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষার নাম হলো বাংলাভাষা। এ ভাষায় শুধু এই বাংলার লোকেরাই নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও কথা বলে। বাঙ্গালিদের ইতিহাসের শেষ নেই, তবুও সকল ইতিহাসে একটা বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হলো বাঙ্গালিরা কখনোই অন্যায় মেনে নেয়নি। হোক যুদ্ধ, হোক শাস্তি, হোক রক্তপাত, হোক মৃত্যু এরা কোনো কিছুতেই দমে না। এমনকি, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনও এদেশ বা এ অঞ্চল হতেই ছড়িয়েছিল। সেভাবেই, ১৯৪৭ সালে যবে থেকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ হয়েছে তবে থেকে পাকিস্তান কিভাবে এ দেশকে শোষণ ও অত্যাচার করেছে তা বলার দরকার নেই। কারণ তা আমরা সবাই জানি। এরপর ১৯৫২ সালে, ছাত্রসমাজ, শ্রমিকেরা যখন পাকিস্তানের এক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন করছিল তখন, তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল সেটি হলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, যাক প্রাণ হোক রক্তপাত তাতে কিছুই যায় আসে না। তারপর তারা অনেকেই শহিদ হয় পুলিশের গুলিতে। তারা তো সফল হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখানে থেকেই শুরু হয় আমার লেখার উদ্দেশ্য। তারা তাদের প্রাণ দিয়েছে বাংলা ভাষার জন্যে। এজন্য আমরা 'ভাষা দিবস' নামক একটি অনুষ্ঠান পালন করি ওদের জন্যে। আবার এ দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারি নামেও পরিচিত। যেটি কিনা ইংরেজি মাসের নামে। আসলে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি, দিনটি হলো ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। আমার মনে হয় যেহেতু সেটি হলো বাংলার জন্যে করা আন্দোলন তাই দিনটিকে ইংরেজি মাসে না ডেকে বাংলা মাসের নামে ডাকাই ভালো। এতে হয়তো ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্য আরো সফল হবে। এতে হয়তো তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

একটি শিক্ষণীয় গল্প

জয়ীতা বিশ্বাস
ষষ্ঠ শ্রেণি

একদিন আকাশে উড়তে উড়তে একটি কাক এক সারস পাখিকে দেখল এবং মনে মনে বলল সে হয়ত এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও ভাগ্যবান পাখি। কারণ এত সুন্দর গায়ের রং তার। তাই কাকটি সারস পাখির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও খুশি পাখি। কতো সুন্দর লাগে তোমায়। সত্যিই তুমি ভাগ্যবান, সারস পাখিটি কাকের দিকে তাকিয়ে বললো, না ভাই আমি এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও ভাগ্যবান পাখি নই। কারণ আমি যখন তোতাকে দেখি তখন তোতার গায়ের রং দেখে আমার খুব হিংসা হয়। তখন কাক আবার তোতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও ভাগ্যবান পাখি।' কী সুন্দর রং তোমার। তোতা পাখি কাকের দিকে তাকিয়ে বললো, না ভাই আমি এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও ভাগ্যবান পাখি নই। কারণ আমি যখন ময়ূরকে দেখি তখন ওর গায়ের রং আর পালক দেখে আমার খুব হিংসা হয়। এ কথা শুনে কাকটি গেল ময়ূরের কাছে ময়ূরকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও ভাগ্যবান পাখি। ময়ূর বললো, আমি এই দুনিয়ার সব থেকে সুন্দর ও ভাগ্যবান পাখি নই। কারণ আমি সুন্দর বলে আমাকে সবাই খাচায় আটকে রাখে, তাই আমি অসুখী। এই গল্প থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, সৃষ্টিকর্তা যাকে যা দিয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

অশরীরী

শেখ ফেরদৌসী নাওয়ার
দশম শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)

রাত ১:২০ মিনিট। কম্পিউটারে অফিসের কাজ সেরে সবেমাত্র একুশে বইমেলা থেকে সদ্য কেনা বইটা নিয়ে বসলাম। এমন সময় কলিংবেল বাজলো। একবার নয়, তিনবার। বাড়িতে এখন আমি ছাড়া কেউ নেই। সবাই কক্সবাজারে ঘুরতে গেছে দু'দিন হলো। এক সপ্তাহের আগে ফিরবে না। আমার কাজের অনেক চাপ থাকার কারণে থেকে গেছি। তাই এত দ্রুত অন্য কারো আসার কথা না। আমার এমন কোনো বন্ধু নেই যে এতো রাতে আমার কাছে আসবে। এসব চিন্তা করে আর গেলাম না দরজা খুলতে। বেশ ঘুম পাচ্ছিল। বইটা পড়া হলো না। ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন যথারীতি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তবে কাজে মন বসল না। কেমন যেন অস্থিরতা কাজ করছে ভেতরে ভেতরে। কাল রাতে খুব বাজে স্বপ্ন দেখেছি। আমি জংলি হয়ে গেছি। কি বিভৎস চেহারা! সে কথা মনে করে বারবার শিউরে উঠছি।

আজ বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কলিংবেলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আবারো তিনবার বাজলো। আলো জ্বালিয়ে ঘড়িতে দেখলাম রাত ১:২০ মিনিট। মনে কেমন যেন সন্দেহ দানা বাঁধলো। সব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার সেই একই স্বপ্ন।

সকালে আর ঘরে মন টিকলো না। ভাবলাম আহসান মঞ্জিলটা ঘুরে আসি, আজ আর অফিসে যাব না। একটু ঘোরাও হবে, মনটাও ফুরফুরে হবে। কিন্তু ওইদিন রাতে যখন আবারো আগের মতো ঘটনা ঘটলো, আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হলো।

রাত ১:২০ মিনিট তিনবার কলিংবেলের আওয়াজ আর সেই সাথে যোগ হলো কুকুরের করুণ আর্তনাদ। কোনো রকমে নিজেকে সামলে দরজার কাছে গেলাম। একবার মনে হচ্ছে দরজা খুলি আবার মনে হচ্ছে না দরকার নেই। সাত-পাঁচ না ভেবে খুলেই ফেললাম দরজা। কেউ নেই শুধু একটা কুচকুচে কালো বেড়াল বসে আছে। মনে আরো ভীতির সঞ্চার হলো। তাও আমি এক অজানা কারণে টর্চ লাইটটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। বিড়ালটা আমার সাথে সাথেই চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে মনে হলো, কেউ যেন আমার পেছনে আছে। পেছনে ফিরলাম। বিড়ালটি নেই। বরং তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক কালো ছায়ামূর্তি। ওটা আবার এগিয়ে এলো। মনে হলো পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে বন বন করে ঘুরছে। হৃৎস্পন্দন বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে মনে হলো। হৃৎপিন্ডে প্রচন্ড রকমের চাপ অনুভূত হলো। তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলাম আশেপাশে প্রচুর মানুষ। সব রকম বয়সের। তবে একটা জিনিস খুবই অবাক লাগলো। স্বাভাবিক অবস্থার মানুষ খুব কমই আছে। উপস্থিত সকল মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই অস্বাভাবিক মানুষ। কারো হাত, পা কিংবা মাথা থেতলানো কিংবা কারো শরীর গভীর ক্ষতচিহ্ন। কারো চোখ ওল্টানো কারো শরীর ঝলসানো। তারা সবাই স্বাভাবিক ভাবেই চলাচল করছে, যেন কিছুই হয়নি। এবার অবাক হলাম, এসব বিভৎস চিত্র দেখে আমার ভয় লাগছে না। যে সামান্য কারণেই ভয়ে জ্ঞান হারাবার জোগাড় হয়ে যায়। আজ তার কোনো ভয়ের অনুভূতি নেই। চলতে চলতে হোঁচট খেলাম। বস্তুটা..... আমার দেহ। আর আমি....এখন... অশরীরী....

একুশের রক্ত স্রোত

নুসরাত জাহান খুশবু
নবম শ্রেণি (ব্যব. শিক্ষা বিভাগ)

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবানে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। বিশাল সভা হবে। মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিন জনশূন্য। মালিকের কাছে বলে ইফাত ও সাদি এসেছে বক্তৃতা শুনতে। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিছিল করে আজিজুল এসেছে। ও দারুন উত্তেজিত। শহরের-এতসব ঘটনা ওকে প্রতিদিন অন্যরকম করেছে। বাড়িতে বাবাওকে নানা কিছু বুঝিয়ে দেয়। সাব্বির আহমদ নিজেও ছাত্রদের নিয়ে সভা করেন। ওদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। আজিজুল সেসব কথাও শোনে। দূর থেকে ইফাতকে দেখে ও চিৎকার করে ডাকে। ইফাত ওকে হাত ইশারায় কাছে আসতে বলে। তারপর তিনজনে জায়গা নিয়ে বসে যায়। স্কুলের ছেলেদের চেয়ে ফুহাদের সঙ্গে বেশি প্রিয় মনে হয় আজিজুল। মাঘ মাসের মাঝামাঝি। শীতের রোদ ওদের বেশ আরাম লাগে। পিঠ রোদে দিয়ে বসেছে। ক্যান্টিনে বসে যারা চা খায় তাদের অনেকে বক্তৃতা করছে। কী আবেগ, কী গমগমে কণ্ঠ। আজ ওর আনন্দ হচ্ছে। শুনলে কেমন মন ভরে যায়, না আজিজুল? হ্যাঁ আজিজুল প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। সাদি আস্তে করে বলে, "আমরা তো রাস্তার ছেলে আমাদের কী এসব মানায়?"

"একশো বার মানায়", আজিজুল জোরের সঙ্গে বলে। সভা শেষে এক বিশাল মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে ওরা হাত ধরে রাখে, পাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক ফাঁকে ইফাত বলে, জানিস যখন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" বলি তখন দম একটুও ফুরায় না। মনে হয় একনাগাড়ে হাজার বার বলতে পারি। আজিজুল বলে, "ঠিক ইফাত ভাই। হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেল। চল কেটে পড়ি।" "ধুৎ! আয় তো।"

ইফাত, সাদি হাত ধরে টান দেয়। তিনজন জনস্রোতে মিশে যায়। আজিজুলের মনে হয় ওরা আর বালক নেই। ওর বাবা তো জানেন না। যে আজিজুল স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিছিলে চলে এসেছে। আজ বাবাকে গিয়ে ও বলবে মিছিলে এসে ও বড় হয়ে গেছে। খুব বেশি বড় না হলেও ইফাতের সমান তো হয়েছেই। ঐটুকু হতে পেরেই ওর আনন্দ হচ্ছে। ওরা বড়দের সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে পারছে। আজিজুলের মনে হয় ওর চারদিকে খোলা। যেদিক খুশি সেদিকেই এগোতে পারে। এখন ওর শুধু ঠিক করা যে ও কোনদিকে যাবে।

বিকেলে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা মুসলিম লীগ সরকারের বিশ্বাসঘাতক তার তীব্র নিন্দা করে এবং বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই সভাতেই ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়। আর কতদিন পরে ইফাত? এখনো অনেক দেরি।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যাবে। দেখছিস শহরের মানুষ কেমন ক্ষেপে উঠেছে। ডাঙ্গুলি খেলার দিনগুলো বুঝি অনেক বেশি ভালো ছিল।

ওর অন্য বন্ধুরা ওর খোঁজে এসেছিল, কিন্তু ইফাত ওকে যেতে দেয়নি। ইফাত এখন ওকে বেশি ভালোবাসে। সারাদিন ওরা তেমন সময় পায় না। ইফাতের আগ্রহ বেশি তাই সাদি নিজে বেশি কাজ করে ওকে যাবার সুযোগ করে দেয়। ইফাত যেন ওর মায়ের পেটের ভাই। কেমন রক্তের টান অনুভব করে। একুশ তারিখের ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্রদের যেমন-সাধারণ মানুষেরও তেমনি উৎসাহের অন্ত নেই। পূর্ণ উদ্দ্যমে চলছে প্রস্তুতি। এগারই ও তেরই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি সংবলিত ব্যাজ বিক্রি করে, একুশ তারিখে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। দেয়ালের লিখনে পোস্টার ছেয়ে গেছে শহর। মানুষের আলোচনার বিষয় একুশে। জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এদিকে ঐ একই তারিখে গণপরিষদে বসবে পূর্ববঙ্গ সরকারের ক্রমগত একমাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেন ১৪৪ ধারা জারি করল। তীব্র প্রতিক্রিয়া থমথমে হয়ে যায় পুরো শহর। ক্ষোভে আক্রোশে পরিপূর্ণ বুকের ক্রন্দন নিয়ে জেগে রইল মানুষ। ইফাত ভাবল আমার মতো রাস্তার ছেলের মৃত্যুও বদলে কি বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে? আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে যায় সারা রাত। হঠাৎ ফুহাদ, আজিজুলকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই আজিজুল, জানিস আমাদের এ দেশের জন্য কত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন?" যেমন: রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার ইত্যাদি আরো কত মানুষ দিল প্রাণ এ দেশের জন্য। আজিজুল, ফুহাদকে বলল, ভাই ফুহাদ আমরা সবাই প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন করি। ফুহাদ বলল, হ্যাঁ ভাই, ঠিক বলছিস!

খুব ভোরবেলা জনশূন্য রাস্তার একা দাঁড়িয়ে থাকে ইফাত। সাদি ডেকেছিল। কিন্তু এত ভোরে ও ঘুম থেকে উঠতে রাজি হলো না। ভোরের বাতাসে ও বড় করে হাই তোলে। শীত লাগছে না। ও ফাঁকা রাস্তায় খানিকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করে। শরীর গরম হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফেলে যে আজাও ক্যান্টিনে ফিরবে না। ও হাঁটতে হাঁটতে ইউনিভার্সিটির চত্বরে আসছে। স্কুলের ছেলেদের

যত বেলা বাড়ছে, প্রতিবাদে, বিক্ষেভে, স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। একটু পর সভা শুরু হলো। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে কিনা এই নিয়ে বির্তক চলছে। ইফাতের অস্থির লাগছে। ওর নিত্য দাসের কথা খুব মনে হয়। আজতো নিত্য দাসের কাজ নেই। এখনো কি ঘুমচ্ছে? লিজার সঙ্গে বিয়েটা কি হয়ে গেল? পরক্ষণে তুমুল স্লোগানে ভেঙ্গে পড়ে এলাকা। দশজন, দশজন করে মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। শুরু হয় গ্রেফতার বরণের পালা। দশজন করে বের হয় রাস্তায় অপেক্ষমান পুলিশ সবাইকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলে। ইফাত একপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখে। তখন আজিজুল দৌড়ে এসে ওর হাত ধরে ইফাত ভাই? আমিতো তোমাকেই খুঁজছি আজিজুল। আমিতো অনেকক্ষণ আগে এসেছি। তোমাকেই খুঁজছিলাম। আমরা এখন কী করব ইফাত ভাই তাদের সঙ্গে থাকব। অন্য কোথাও যাব না। দেখছিস না কেমন গ্রেফতার চলছে। ইফাতের বুক কাঁপে থরথর করে। দেখতে দেখতে অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে ট্রাক চলে যায় লালবাগ থানায়। এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ওদের চোখ জ্বালা করে। ওরা দৌঁড়ে পুকুরের পাশে চলে আসে। আঁজলা ভরে পানি তুলে চোখে ঝটপট দেয়। অনেকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেউ কেউ ঝাঁপ দেয় পুকুরে। ইফাত আর আজিজুল কারো কারো জন্য রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে আসে। চোখ মুছিয়ে দেয়। নিজেদের যন্ত্রণা তেমন নয়। ভুলে যায় সেটুকু। এই যন্ত্রণা এবং উত্তেজনায় ছাত্ররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বেলা বাড়ে। সূর্য মাথার ওপর খাড়া। শীতের দুপুর বলে ঝাঁঝালো রোদ নয়। দুটো পর্যন্ত চলে গ্রেফতার বরণের পালা। এর মাঝে ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ এসে জড়ো হতে থাকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেট। ওরা নিজেরা বুঝতে পারে না কীভাবে এখানে এলো। ওরা এখন মেডিকেলের হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে। সাদি ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। ইফাত, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? মাগো তোর কী যে সাহস! আমি তো ভয়েই বাঁচি না। ইফাত ওর কাঁধে হাত রাখে। ভয় কী সাদি? আয়। না আমি যাব না। আমি এদিকেই থাকি। সাদি ভেতরের দিক চলে যায়। ইফাত দেখল এখন আর ছাত্ররা একা নয়। স্রোতের মতো মানুষ এসে মিলিত হয়েছে। শত শত মানুষ দলবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরোলেই-তাড়া করে পুলিশ। বেলা সোয়া তিনটার দিকে এম.এন এ ও মন্ত্রিরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। পরিষদ ভবনের কোণে চৌরাস্তায় মেশিনগান পাতা হয়েছে। তৈরি হয়েছে কাঁটা তারের ব্যারিকেড। উত্তাল হয়ে ওঠে জনতার স্লোগান। কেউই আর কোনো বাঁধা মানতে চায় না। মিছিল এগিয়ে আসতে চাইলেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাড়া করতে করতে ঢুকে পড়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। শুরু হয় খন্ডযুদ্ধ। মানুষ ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জে দমাতে না পেরে পুলিশ গুলি চালায়। পড়ে যায় মাহিম। বুলেট থেকে ধোঁয়া বেরোয়, গলিতে মগজ বেরিয়ে পড়ে। আহত হয় বরকত। ওকে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায় ছেলেরা। সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে ছেলেরা কাঁদে। মেডিকেল কলেজের ছেলেরা অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ, পুলিশ গুলিতে ইফাতের লাগল। আজিজুল আর ফুহাদ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেল কিন্তু ইতিমধ্যে সাংবাদিক জাগরণ সংবাদে ছাপিয়ে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজিজুল আর ফুহাদ ইফাতকেও বাঁচাতে পারল না।

মুক্তিযুদ্ধ

নাম: মারুফ হাসান অন্তর
নবম শ্রেণি (ব্যব. শিক্ষা বিভাগ)

মুক্তিযুদ্ধ হলো বাঙালির গর্ব। এর ফলে বাঙালি পেয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পেয়েছে একটি স্বাধীন পতাকা। প্রায় ত্রিশ লক্ষ শহিদদের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও একটি স্বাধীন পতাকা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করেছে। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ হয়। বাঙ্গালিরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করে। এরই মাঝে প্রতিবেশি দেশ ভারত বাংলাদেশের অনেককে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করেন। এরই মাঝে নয়মাস যুদ্ধের পর পাক বাহিনীরা ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টা বেজে ৩১ মিনিটে তারা আত্মসমর্পন করে এই বীর বাঙালির কাছে। বাঙালিরা বিজয় অর্জন করে। প্রতি বছরে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করি।

একুশে ফেব্রুয়ারি

নাম: অনিক ইসলাম
নবম শ্রেণি

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় ও স্মরণীয় দিন। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এদিনেই বাঙালির বুকের রক্ত ঝরেছিল রাজপথে। পরবর্তীতে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ইউনেস্কো এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করে। প্রথম দিকে কেবল ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলেও পরবর্তীতে গোটা দেশবাসী তাদের সমর্থন জানায়, ছাত্রদের প্রতিবাদ দমন করতে তৎকালীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্ররা তা ভঙ্গ করে। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি মিছিল বের করে। সাথে সাথে পুলিশ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার সহ নাম না জানা আরও অনেকে শহিদ হন। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এখন প্রতি বছরই একুশে ফেব্রুয়ারিতে সারা বিশ্বেই ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করে থাকি। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকলে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গাইতে গাইতে নগ্নপায়ে প্রভাত ফেরি করে। ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ছাড়াও সারাদেশে অসংখ্য শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে। এদিন সকালে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানায়। আমাদের জাতীয় জীবনে এ দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বুকের তাজা রক্ত ঝরা এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার। এটিই পরবর্তীতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। বুকে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে।

একজন বীরের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার গল্প

নাম: তানিয়া আক্তার তিশা
নবম শ্রেণি (ব্যব. শিক্ষা বিভাগ)

তখন সবেমাত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করেছে পাক বাহিনী। রেডিওতে মুক্তিযুদ্ধের দু-একটা হামলার কথা শোনা যেতো। তার কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামে পাক বাহিনী ক্যাম্প করলো। আমরা যুবকেরা লুকিয়ে থাকতাম। দেখলেই ধরে নিয়ে মেরে ফেলতো আমাদের। একদিন মোড়ের দোকানের পিছনে বসে রেডিও শুনছিলাম। হঠাৎ দেখি সবাই দৌঁড়ে পালাচ্ছে। আমি একজন যুবককে দাঁড় করিয়ে জানতে চাইলাম সবাই কোথায় যাচ্ছে। সে বলল, তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাতে যাবে। এ দেশ আমাদের। এ দেশের মাটি আমাদের। তাই এ দেশের মাটিতে পাক বাহিনীদের জায়গা হবে না। এই বলে চলে গেল। ওর বলা কথাগুলো আমার মাথায় ঘুরতে থাকল, আমরা কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছি ওদের ভয়ে। তাই আমিও যোগ দিলাম মুক্তিযুদ্ধে। কিছুদিন পর যখন আমরা পাক বাহিনীদের ক্যাম্পে আক্রমণ করলাম তখন আমার এক বন্ধু করিম এক বিশাল বোমা নিয়ে ওদের ক্যাম্পে ছুড়ে মারলো আর পাক বাহিনীদের বন্দুকের গুলিতে ঝাজরা করে দিল করিমের পুরো শরীর। সে মারা যাওয়ার আগে বলল, সে বিজয়ী হয়েছে পাক বাহিনীদের কিছু লোককে মেরে দেশ হতে কিছু কমাতে পেরেছে আর তার মুখে ছিল বিজয়ীর হাসি। আর তার এই কথাগুলো আমার ভিতরের সাহস জাগিয়ে তোলে।

শেষ পর্যন্ত আমরাই বিজয়ী হয়েছি। এ দেশ থেকে ওদের তাড়াতে পেরেছি। এদেশ আমাদের। এ দেশের মাটি, ফসল, নদী, গাছপালা সবকিছু আমাদের। আমরা পেরেছি এই দেশকে শত্রু মুক্ত করতে। ৩ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা। আমরা পেরেছি এই দেশকে স্বাধীন করতে। তাদের সবার প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মুনমুন রহমান ইকরা
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস বর্বরতার মুখে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয় বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম। দীর্ঘ সংগ্রামের সফল পরিণতি ও পূর্ণতা আসে সে বছরেরই ১৬ই ডিসেম্বর। এ দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলে মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে বাংলার ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালি সৈন্য থেকে শুরু করে অগণিত নিরীহ অসহায় মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ট্যাংক, কামানসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তারা। বাংলার সবুজ-শ্যামল মাটি সিক্ত হয়েছিল নিরস্ত্র বাঙালির লাল রক্তে। যত্রতত্র অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে ধ্বংসপুরীতে পরিণত করতে চেয়েছিল তারা এ জনপদকে। এ হিংস্রতা, বর্বরতা ও অন্যায় আগ্রাসন মুখ বুজে সহ্য করেনি বাংলার মানুষ। যার যা আছে তাই নিয়েই প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে এনেছিল কাঙ্খিত বিজয়। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। ১৯৪৭-এর পর থেকে একের পর এক আন্দোলনের সিঁড়ি ডিঙিয়ে চূড়ান্ত ফসল হিসেবে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২-র সামরিক আইন ও শিক্ষা কমিশন রিপোর্টবিরোধী আন্দোলন, ৬৬-র ছয় দফার - আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানেরই চূড়ান্ত পরিণতি - ৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম। অমর একুশে ফেব্রুয়ারির পথ বেয়েই এসেছিল ১৬ই ডিসেম্বর। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ সাধারণ জনগণকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যেসব বাঙালি সৈন্য ছিল তারা এবং আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরাও তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সাথে সংহতি প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। রাস্তায় যাকেই দেখতে পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালায়। পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাসহ বহু আবাসিক এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়, অসংখ্য মানুষ হত্যা করে ও লুটপাট চালায়। মধ্যরাতের পর হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রেফতারের পূর্বেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত হয় স্বাধীনতার "ঘোষণা"। ঘোষণার পরপরই সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তিযুদ্ধ। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননের নামকরণ হয় মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধ চালানোর সুবিধার্থে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী, তার তত্ত্বাবধানে সমগ্র দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। বাঙালিদের সংগ্রামের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সরকারের সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং অত্যাচারিত বাঙালিদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের পর দেশের সর্বস্তরের জনগণ প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী সকল পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকাও ছিল গৌরবোজ্জ্বল। এছাড়া সংবাদপত্র, স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র ও প্রবাসী বাঙালিরাও নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। জীবনের মায়া ত্যাগ করে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে লাখো শহিদের রক্ত, অগণিত মানুষের চোখের জল আর কোটি মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন এবং দুই লক্ষ বাঙালি নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। বাংলাদেশের একশ্রেণির লোক পাকিস্তানিদের এ নৃশংসতাকে সমর্থন ও মদদ দিয়েছে। এ শ্রেণির সহায়তায় নৃশংসতম ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে বাঙালি শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিল্পী ও চিন্তাবিদ। এভাবেই বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড পরিকল্পিত ও নীল নকশা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বা গণহত্যা বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ চলে। ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড ভয়াবহ রূপ নেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসের প্রতিটি ক্ষণ ছিল চরম আতঙ্ক আর অপরিসীম আশায় উদ্বেলিত। বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ করতে। এমন আত্মবিশ্বাস আর গভীর দেশপ্রেমের চেতনায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, মিথ্যার বিরুদ্ধে শাশ্বত সত্যের এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামের মূর্ত চিত্র। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

রসায়নের রস আহরণ

কিলিয়োন বৈদ্য
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)

রসায়ন বা কেমিস্ট্রি শব্দটির সাথে আমরা সবাই খুব বেশি পরিচিত। প্রথম ল্যাবরেটরীতে পদ্ধতিগতভাবে রসায়ন চর্চা করেন মধ্যযুগের আরবীয় আলকেমিস্ট জাবির ইবনে হাইয়ান। তাই তাকে কখনো কখনো রসায়নের জনক বলা হয়ে থাকে। তবে রসায়নের জনক বলা হয় মূলত জন ডাল্টনকে, যিনি বলেছিলেন যে পরমাণু সমূহ (Atoms) বিভাজ্য। এর উপর ভিত্তি করে তিনি ১৮০৩ সালে কিছু মতবাদ দেন। যা ডাল্টনের পরমাণুবাদ নামেই খ্যাত। তবে আধুনিক রসায়নের জনক অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে, ল্যাভয়সিয়েই প্রথম মৌলিক পদার্থকে ধাতু ও অধাতু এই দুটি বিষয়ে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। এবার আসা যাক মৌলিক পদার্থে অথাৎ পর্যায় সারণিতে (periodic table)। আগে আমি মনে করতাম যে, যে মৌলের পারমানবিক সংখ্যা ছোট সেটি সবচেয়ে আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এখন বুঝি যে, সেটা ভুল ধারণা ছিল। আমি রসায়নের প্রেমে পড়ি ২০২০ সালে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়। তখন লকডাউনে বাসায় বসে কিছু করার ছিল না। তাই ইউটিউবে সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও দেখতাম। দেখতে দেখতে Nilered এবং Nurdrage নামক দুটি ইউটিউব চ্যানেল আমার পছন্দ হলো। এদের কাছ থেকেই রসায়নের উপর আমার আগ্রহ জন্মায় এবং রসায়নের বিভিন্ন পরীক্ষণের উপর আমার দাদাগিরি শুরু হয়। বাসার গ্লিসারিন নিয়ে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাহায্যে আগুন ধরিয়েছি। ভিনেগার বাসায় আনলে। সেটা রান্নাঘরে না থেকে আমার আওতায় চলে আসত। আমি মনের মাধুরী মিশিয়ে উল্টা-পাল্টা পাগল মার্কা সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকি। আমার যতদূর মনে হয় আমার করা প্রথম রসায়নের পরীক্ষণটি ছিল ভিনেগার এবং বেকিং সোডার ভিতরে বিক্রিয়া। সর্বশেষ যে এক্সপেরিমেন্ট করেছি সেটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাহায্যে সোডিয়াম উৎপন্ন করা। আমার আরেকটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মায় সেটি হচ্ছে মৌলিক পদার্থ সংগ্রহ। এর জন্য আমি বিভিন্ন বিক্রিয়ায় ভিন্ন-ভিন্ন মৌল উৎপন্ন করি এবং হাতের কাছের অনেক মৌল সংগ্রহ করি। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি মৌল তৈরি করা সত্ত্বেও মৌলগুলো গ্যাসীয় হওয়ায় সংরক্ষণ করতে পারিনি। আমার সংরক্ষিত মৌলগুলো হলো, কার্বন, সিলিকন, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, তামা, নিকেল, ক্রোমিয়াম সোডিয়াম, ফসফরাস, ট্যান্টালাম, ক্যালসিয়াম, টিন ও সীসা, সালফার ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সাহায্যে আমি প্রথম সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) তৈরি করা শিখি। এরপর বিভিন্ন এসিড, যৌগ তৈরি করা শিখি। আমার কাছে প্রিয় দুটি মৌল হলো পারদ এবং ব্রোমিন। পারদ ধাতু হয়েও তরল এবং ব্রোমিন গ্যাস হয়েও তরল। আমি ঘচক ফার্টিলাইজার ব্যবহার করে Nitric Acid (HNO_3) তৈরি করি যেটা খুবই বিস্ময়কর ছিল। এই ছিল আমার রসায়নের রস আহরণের কিছু চেষ্টা। যে চেষ্টা আমি এখনো করে চলেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো!

জুবায়ের আহম্মদ তাকবীর
দশম শ্রেণি (ব্যব. শিক্ষা বিভাগ)

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অর্ক ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর প্রধান শিক্ষক বক্তব্য দেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধা রহমান সাহেবকে বক্তব্য দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রহমান সাহেব বলেন, ''ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রময় পরিস্থিতির সময়ে আমি ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। যখন গুরুজনদের মুখে শুনেছিলাম আমাদের বাংলা ভাষার বদলে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে হবে তখন বেশ খারাপ লাগল। যেই ভাষা মায়ের মুখ থেকে ধীরে ধীরে শিখলাম সেই ভাষায় কথা বলার অধিকার আমাদের নেই?"

তিনি সবশেষে আরও বলেন,

"আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেকে নিজের জীবন দান করেছেন। তারা নিজেদের পরিবারের সদস্য মা-বাবা, ভাই-বোন এর জীবন ঝুঁকিতে রেখে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আমাদের দেশকে কিভাবে উন্নত, সমৃদ্ধ করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তোমরা (শিক্ষার্থীরা) ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা করবে, আশা করি তোমরা উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।"

জীবনের রঙে গণিত

শ্যামসুন্দর চৌধুরী
সহকারি শিক্ষক (গণিত)

আমি মনে করি, গণিতের নানা অনুশীলনী আর সমস্যা সমাধানের কৌশল শেখানোর পাশাপাশি একজন গণিত শিক্ষকের একটা বিরাট দায়িত্ব হলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদের কৌতূহলকে জাগ্রত রাখা। কেউ যদি নিজের মতো করে গণিত সমাধান করতে চায়, সেটাকে নিবৃত্ত না করে বরং উৎসাহ দেওয়া। এই কাজগুলো অনেকেই করেন না। এইটা জেনে কি হবে, তুই কি বেশি বুঝিস, আগের ক্লাসের ওইটা পারিস? যে এইটা জানতে চাস, সাহস কত যে উপপাদ্য নিজের ভাষায় লিখিস, আমি যেভাবে অঙ্ক করিয়েছি ওইভাবে করবি, এমন অযৌক্তিক বাক্যগুলো এখনো শোনা যায় প্রায়ই। এতে গণিত হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য আর ভীতিকর। অথচ গণিত কি অপার আনন্দের একটা বিষয়! কত দারুণ সব চিন্তা আছে এর নানা শাখায়।

আমি জানি, গণিত নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক প্রশ্ন । 'কেন এমন হয়, কেন অমন হলো না, এটা কোথা থেকে এল, ওটা জেনে লাভ কি, -এমন দারুণ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিজেরই জানা হয়ে যায় অনেক কিছু। কিছু প্রশ্ন তো রীতিমতো চ্যালেঞ্জিংও। এই প্রশ্নগুলো যখন আমরা মেরে ফেলি, আমরা হয়তো ধ্বংস করে দিই ভবিষ্যতের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদকে। ভবিষ্যতের যে হতে পারতো বিজ্ঞানের মহিরুহ, তার বীজ হয়তো আমরা শেষ করে দিচ্ছি অঙ্কুরেই। এটা অন্যায়। ছোট্ট একটা প্রশ্ন কিংবা আপাত তুচ্ছ একটা ভাবনাকেও হারিয়ে যেতে দিতে নেই। কারণ সেখান থেকেই একসময় জন্মাতে পারে গণিতের গভীর বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা।

সুন্দর চিন্তা অনেক আনন্দের একটা ব্যাপার। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, খাবারের সংস্থান থাকলে, শুধু চিন্তার আনন্দেই একটা অর্থবহ জীবন পার করে দেওয়া যায়। গণিত হলো গুছিয়ে চিন্তা করার ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা। গণিতের আনন্দ পেতে হলে গণিত অনুভব করতে হয়। আমার আনন্দ অনেকগুণে বেড়ে যায়, যদি দেখি আমার মতো আরো অনেক মানুষ আনন্দটা অনুভব করছে। আমি আমার অন্তর থেকে বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিষয়টা হচ্ছে গণিত। এখন আমি যদি মানুষকে বলি এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিষয়, সবচেয়ে মজার বিষয়, মানুষ কেন আমাকে বিশ্বাস করবে? সেই চিন্তা থেকে গণিতের খুব মজার কিছু বিষয় তুলে ধরার ক্ষুদ্র এই প্রয়াস!

প্রথমে স্মরণ করছি, যাকে বলা হয় ইতিহাসের প্রকৃত গণিতবিদ (First True Mathematician)। তিনি হচ্ছেন মহান পিথাগোরাস, যার উপপাদ্য আমরা প্রায়ই তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে থাকি। তার জীবন নিয়ে একটু বলি। এই যে মহান পিথাগোরাস, তিনি কী ধরনের মানুষ ছিলেন? আসলে তিনি ছিলেন বড়ই অদ্ভুত কিসিমের মানুষ। পিথাগোরাস চিন্তা করতেন এই পৃথিবীর সবকিছুই আসলে সংখ্যা দিয়ে তৈরি। তিনি বলতেন, এক হচ্ছে ঈশ্বরের সংখ্যা, দুই হচ্ছে প্রথম নারী সংখ্যা, তিন হচ্ছে প্রথম পুরুষ সংখ্যা এবং দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ হয়, পাঁচ হচ্ছে বিবাহ সংখ্যা! সবকিছুকেই তিনি কেমন যেন 'সংখ্যা সংখ্যা' করে চিন্তা করতেন। তো একবার তার এক ছাত্র এসে তাকে জিজ্ঞেস করল-

- 'আচ্ছা গুরু, বন্ধুত্ব কী জিনিস? 'গুরু তো সবকিছু চিন্তা করেন সংখ্যা নিয়ে, সুতরাং তিনি বললেন-'আহা বন্ধুত্ব! ওরে পাগল, এটা আমি বুঝি। আসলে ২২০ আর ২৮৪- এর মধ্যে যে সম্পর্ক তাকেই বলে বন্ধুত্ব।' শুনে তো ছাত্রের মাথা খারাপ!

- 'গুরু এটা আবার কি বললেন? একটু ব্যাখ্যা করেন'!

-'দাড়া, বোঝাচ্ছি! এদিকে আয়- ২২০ এর উৎপাদকগুলো আছে সেগুলোর দিকে তাকা। উৎপাদক বুঝিস তো? যেসব সংখ্যা দিয়ে ২২০-কে নিঃশেষে ভাগ করা যায়, তারা হল ২২০ এর উৎপাদক। খেয়াল করে দেখ - ২২০ এর উৎপাদক হচ্ছে ১, ২, ৪, ৫, ১০, ১১, ২০, ২২, ৪৪, ৫৫, ১১০, ২২০। আর ২৮৪ এর উৎপাদক কী কী ? ২৮৪ এর উৎপাদক হচ্ছে ১, ২, ৪, ৭১, ১৪২, ২৮৪। তুই কি জানিস প্রকৃত উৎপাদক (Proper divisor) কাকে বলে?

-'না তো গুরু'!

-'তাহলে শোন। প্রতিটি সংখ্যা দিয়ে তো ঐ সংখ্যাকেই ভাগ করা যায়, যার ভাগফল হয় ১। তার মানে প্রতিটি সংখ্যা নিজেই নিজের উৎপাদক। এই নিজেকে বাদ দিলে বাকি যে উৎপাদকগুলো থাকে সেইগুলো হচ্ছে 'প্রকৃত উৎপাদক'। মানে হচ্ছে, ধর ২২০ এর ক্ষেত্রে ২২০-কে বাদ দিলে বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে ২২০ এর প্রকৃত উৎপাদক। তাহলে বলতো ২৮৪ এর প্রকৃত উৎপাদক কোনগুলো?

- 'কেন গুরু, এইযে ২৮৪ বাদ দিয়ে বাকিগুলো!

- বাহ। এখন এর মধ্যে বন্ধুত্ব কিভাবে এলো, তাই না? দেখ। এই ২২০ এর সমস্ত প্রকৃত উৎপাদক তুই যদি যোগ করিস, তাহলে পাবি ২৮৪। আর ২৮৪ এর সমস্ত প্রকৃত উৎপাদক যদি তুই যোগ করিস তাহলে পাবি ২২০।

অর্থাৎ ১+২+৪+৫+১০+১১+২০+২২+৪৪+৫৫+১১০ = ২৮৪ এবং ১+২+৪+৭১+১৪২=২২০। এরা দু'জন দু'জনার জন্য, একজনের মধ্যে অন্যজনের বসবাস। আর জন্যই এরা আসল বন্ধু!

এবং সত্যি এখন পর্যন্ত ২২০ এবং ২৮৪ কে বন্ধু সংখ্যা বা Amicable Numbers বলা হয়। বন্ধু দিবসে এখন বন্ধুকে মেসেজ পাঠানো যেতে পারে, 'আমাদের বন্ধুত্ব ২২০ আর ২৮৪ এর মতো হোক!'

তো, গণিত নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্নভাবে চিন্তা করেছে। কখনো সংখ্যা নিয়ে, কখনো সমীকরণ নিয়ে, কখনো উপপাদ্য, সম্পাদ্য, তত্ত্ব, সমস্যা এমন নানা কিছু নিয়ে। আমার সবসময় একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করত- গণিতের এই যে এতসব ধারণা, এগুলো মানুষের মাথায় এলো কিভাবে? ধারণাগুলো কিভাবে বিকশিত হলো? যেমন : আমরা জানি 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' বলে একটা ব্যাপার আছে। এটা কার মাথায় প্রথম এসেছিল, কে আবিষ্কার করেছিল? শুনে মনে হতে পারে - কেন? পিথাগোরাসের উপপাদ্য কে আবিষ্কার করবে, পিথাগোরাসই আবিষ্কার করেছিল। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা না। পিথাগোরাসের আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ এটা জানত। কিভাবে তিনি এটা আবিষ্কার করলেন, সেটা খুবই মজার একটা গল্প। কৌতূহলী হয়ে পড়তে থাকুন, পরের কোনো এক সময় সেই গল্প বলা হবে!

আরেকটা ব্যাপার বলি। অনেক বিষয়ই আছে যেগুলো আমরা মনে করি, আমরা জানি - আসলেই জানি কি না এটা কিন্তু আমরা জানি না! গণিত আমার কাছে কখনোই ধরাবাঁধা কিছু নিয়ম বলে মনে হয়নি। অনেকেই ভাবে, গণিত আর কি! কতগুলো নিয়ম আছে - সেগুলো ধরে ধরে অংক কষলেই সমাধান হয়ে গেল! মূল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই এরকম না। গণিতের অনেক কিছু অন্তর থেকে অনুভব করা যায়। আমি নিজে অনুভব করতে চাই, আর চাই মানুষও অনুভব করুক! যেমন : আমরা জানি ১ কে ০ (শূণ্য) দিয়ে ভাগ করলে সেটা অসংজ্ঞায়িত হয়। কিন্তু কেন? কেন আসলে এরকম হলো? ০ - কে ০ দিয়ে ভাগ করলে আসলে কী হতে পারে? বিয়োগে বিয়োগে যোগ (মাইনাসে মাইনাসে প্লাস) হয়, এটা একদম ছোটবেলা থেকে জানি। আমরা কি অনুভব করি, এটা কেন হয়? আমরা কি কোনো প্রাথমিক নিয়ম (Elementary Method) দিয়ে, সহজ কোনোভাবে একে ব্যাখ্যা করতে পারি? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন সব সময়ই আমার মাথায় ঘুরপাক খেত। সেগুলোই পরে আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করেছি। একটু আধটু যা জেনেছি, সেগুলোই আমি আপনাদের জানাতে চাই।

অবশ্যই প্রত্যেকটি বিষয় আমরা গল্পের মাধ্যমে জানার চেষ্ট করবো। কারণ গণিতের গল্পগুলো যদি না জানা যায়, তাহলে ভেতরের মজাটা আসলে পাওয়া যাবে না। একেকটা চিন্তা কিভাবে জন্ম নিল সেই গল্পগুলো অনেক সুন্দর হয়! আবার কিছু ঘটনা যেমন মজার, তেমনি কিছু ঘটনা আছে খুবই বিব্রতকর! আমরা ক্যালকুলাসের কথা অনেকেই জানি। ক্যালকুলাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া হয় মূলত দুজন মানুষকে - নিউটন এবং লিবনিজ। যখন প্রথম এই ক্যালকুলাসটা আবিষ্কৃত হলো তখন গণিতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঝগড়াগুলোর একটা লেগে গিয়েছিল। এবং সেই ঝগড়টা ছিল এই খুব বিখ্যাত দুজন মানুষের মধ্যে। স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং লিবনিজ - এদের মাঝে ক্যালকুলাসকে আগে আবিষ্কার করেছে সেটা নিয়েই কলহ! আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, কয়দিন পরে রয়েল সোসাইটিতে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। ঠিক আছে, কে আগে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছে তা তদন্ত করে দেখা হোক। মজার বিষয় হচ্ছে পদাধিকার বলে সেই তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন নিউটন নিজেই। এবং নিউটন অনেক অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন - হ্যাঁ, নিউটন আগে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছে! কী হাস্যকর একটা বিষয়, তাই না! এখন অবশ্য দুজনকেই যৌথভাবে ক্যালকুলাস আবিষ্কারের সম্মান দেওয়া হয়।

যাহোক এমন অনেক গল্প বলবো এবং অনুভব করবো গণিতের আরও দারুণ সব বিষয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন, যাকে বলা হয় গণিতের রাজপুত্র - তিনি হচ্ছেন, জার্মান গণিতবিদ 'কার্ল ফ্রেডরিখ গাউস'। এই যে গাউস, ছোটবেলা থেকে তিনি গণিতে অসম্ভব রকম প্রতিভাধর ছিলেন। কী রকম? তখন তার বয়স মাত্র ৩ বছর। তার বাবা বসে বসে বিশাল লিস্ট ধরে যোগ করছেন। যেই যোগ করা শেষ, কোথেকে পিচ্চি গাউস এসে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'ও বাবা, তুমি তো ভুল করেছো। ওটাতো এইটা হবে'। বাবা তখন হিসাব মিলিয়ে দেখেন আসলে তো তাই! তার ছেলেটা কিভাবে বলল? চিন্তা করুন, তখন বয়স মাত্র ৩ বছর! গাউস গণিত নিয়ে কি পরিমাণ পাগল ছিলেন সেটার কথা বলি। গাউসের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। তার সহকারী তাকে এসে খবর দিলেন, 'গাউস ভাই, আপনার স্ত্রী তো মৃত্যুশয্যায়, আপনি কি অংকটা রেখে একটু স্ত্রীর কাছে যাবেন?' তখন গাউসের উত্তর ছিল, 'ভাই, ওকে আর কিছুক্ষণ দেরি করতে বলতে পারবে?' কী ভয়ঙ্কর চিন্তা! বলুন তো! গাউসকে নিয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত যে গল্পটা সেটা হচ্ছে তার প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময়। তার একজন খুব কড়া টিচার ছিলেন 'মিস্টার বাটনার'। বাটনার সাহেব ক্লাসে ঢুকে দেখেন ছেলেপেলে অনেক চেঁচামেচি করছে। তাই দেখে, ওদেরকে কাজ দিলেন, 'এই তোরা ১ থেকে শুরু করে ১০০ পর্যন্ত সবগুলো যোগ কর। ১ যোগ, ২ যোগ, ৩ যোগ, ৪ এমন করে করে সবগুলো যোগ করতে থাক। আমি একটু রেস্ট নিয়ে নিই'।

তো নিয়ম ছিল যে, যার আগে হয়ে যাবে সে তার স্লেটটা এনে জমা দিবে। তো বাটনার সাহেবের কথা মুখ থেকে মাটিতেও পড়েনি তার আগেই গাউস তার স্লেট নিয়ে হাজির।

-স্যার, এই যে, ৫০৫০।

- মানে! তুই কিভাবে পারলি?

- স্যার এটাতো খুব সোজা।

- সোজা এটা? তাহলে ব্যাখ্যা কর।

- স্যার এটাতো কোনো ব্যাপারই না। মনে করেন ১+২+৩+ .....এমন করতে করতে ৯৮, ৯৯, ১০০ যোগ করতে হবে, তাই না?

-হ্যাঁ

- দেখুন স্যার, আমি সামনের একটার সাথে পিছনের একটা নিয়ে যোগ করবো। দেখুন, ১ আর ১০০ যোগ করলে কত হয়, ১০১। ২ আর ৯৯ যোগ করলে কত হয় ১০১। ৩ আর ৯৮ যোগ করলে কত হয়, ১০১। এমন করে, ৪ আর ৯৭ যোগ করলে ১০১। ৫ আর ৯৬ যোগ করলে ১০১। এমন করে কতগুলো জোড় বানানো যাবে চিন্তা করুন। ১০০টা সংখ্যা আছে। তাহলে জোড় বানানো যাবে (১০০/২) মানে ৫০টা। প্রত্যেকটা জোড়ার মানই হবে ১০১ করে। তাহলে, যোগফল হবে ৫০×১০১। মানে ৫০৫০। স্যার, হয়ে গেছে।

এই যে চিন্তাটা সেটা এতটাই অসাধারণ ছিল যে এখন পর্যন্ত আমরা সেটা ব্যবহার করি।

গণিতের যে মায়া , গণিতের যে সৌন্দর্য, তার অনেক বড় অংশ হচ্ছে চিন্তার মাঝখানে। আপনি যখন খুব সুন্দর করে কিছু একটা চিন্তা করেন, আপনি এটার সমাধানে পৌঁছান কি না-পৌঁছান ..... ঐ চিন্তাটুকুই অনেক বেশি আনন্দের। ঐ চিন্তাটুকুর জন্যই গণিত করা যায়। শুনতে অনেকটা রূপকথার মতো লাগতে পারে, কিন্তু আমি সত্যিই বিশ্বাস করি- যখন আমরা কোনো একটা ভালো চিন্তা করি, তখন কল্পনার জগতে একটা ফুটফুটে সুন্দর স্বপ্নের শিশু জন্ম নেয়। সে স্বপ্নের শিশুটা হয়তো একদিন বড় হয়ে অনেক বড় একটা অর্জনে পরিণত হবে।

এখন আমি যে গল্পটা বলবো, সত্যিই কোনো গল্প না।
পুরো গল্পের বেশির ভাগই নিছক আমার কল্পনা।
আইডিয়া সব সত্যি, তাই এর গুরুত্বটা অল্প না!
না! না!
পিথাগোরাস মহামুনি,
চলো তার গল্পটা শুনি।
আড়াই হাজার বছর আগে,
স্যামোস দ্বীপের মধ্যভাগে।
জন্ম নেন এই মহান লোক
ছিল সংখ্যাতে খুব ঝোঁক।
স্বর্গ, মর্ত্য, আত্মাও নাকি সংখ্যা মেনে চলে।
শুনে অবাক লোকেরা যোগ দিল তার দলে।
জ্ঞানের প্রেমিক তিনি নিজেকে বলেন,
জ্ঞান সন্ধানে কত দেশ পাড়ি দেন।
জ্ঞান পিপাসা নিয়ে,
বুকেতে আশা নিয়ে,
সাগর পাড়ি দিয়ে,
চলে যান মিশরে।
কোথায় কী জ্ঞান আছে,
কোথায় ওয়াইজম্যান (Wise Man) আছে,
ছুটে যান তার কাছে,
শেখেন প্রাণভরে।
তো একদিন রাতে,
মিশরীয়দের সাথে,
কী করলেন গুরু?
গল্পের তো সেখানেই শুরু।
গুরু বললেন, সরো
কী যে তোমরা কর?
শুধু জন্মাও আর মরো।
বলি, কিছুতো একটা ধরো।
তোমরা সংখ্যা বোঝ না।
তোমরা সত্য খোঁজ না।
নেই জ্যামিতির জ্ঞান,
শুধু করো প্যান প্যান।
আর করো কূটনামি,
না বুঝেই পাকনামি।
উফ!!! বোর হয়ে গেলাম আমি।
আমি বলতে পারি আরো,
তার আগে বলো, লম্ব আঁকতে পারো?
সেই কথা শুনে একজন মিটিমিটি হাসে।
সেও যে লম্ব আঁকতে বড় ভালোবাসে।
- পিথাগোরাস সাহেব!!!!
আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু জ্ঞানশূণ্য নই।

লম্ব কেমনে আঁকতে হয়, দেখিয়ে দেবই।
আমাদের আঁকার পথ বড়ই অদ্ভুত!
বারো গিটের দড়ি দিয়ে আঁকব নিখুঁত!
- অ্যাঁ!! বারো গিটের দড়ি দিয়ে লম্ব ক্যামনে আঁকো?
এতোকিছু জানি আর এইটা জানি নাকো।
দেখাও তো দেখি কোথায় দিচ্ছো গোঁজামিল?
ভুল জ্ঞান দেয়া কিন্তু পাপের শামিল!
না না গুরু ভয় নেই,
শেখাবো না ভুল।
বারো গিটের এ নিয়ম বড় বিউটিফুল।
একখানা দড়ি নিয়ে, সমান সমান দূরে,
বারো খানি গিট দিয়ে আসবেন ঘুরে ঘরে।
দুই মাথা বন্ধ,জেড়া দিয়ে রাখা।
যন্ত্র এবার প্রস্তুত, রইল বাকি আঁকা।
এমনভাবে এবার টেনে ধরুন দড়িটাকে,
একপাশে চারখানা গিট যেন থাকে।
অন্যপাশে পাঁচ খানা, আরেক পাশে ছয়।
পুরোটা দেখতে যেন ত্রিভুজের মতো হয়।
দাঁড়াও! দাঁড়াও! দাঁড়াও!
চার, পাঁচ, ছয় মিলে পনেরো তো হয়।
বারোর হিসাবটা তো মিলবার নয়!
না না গুরু ঠিকই আছে, দেখুন ভালো করে।
কোণারগুলো দুই বাহুতে কমন কিন্তু পড়ে!
এরই মধ্যে লম্ব কিন্তু আঁকা হয়ে আছে,
চারটা গিট আর পাঁচ গিটের দুই বাহুর মাঝে
অ্যাঁ! কই, তাইতো দেখি আজব ব্যাপার,দেখি নি তো আগে।
এমন কেন হলো মনে বড়ই প্রশ্ন জাগে!!
সেই প্রশ্নের উত্তরটাই খুঁজতে হয়তো গিয়ে,
পিথাগোরাস তার সেই উপপাদ্য গেলেন পেয়ে।
সত্যিই আজও এই পৃথিবী নানান রঙের খেলা,
তুচ্ছ ভেবে কিচ্ছুটিকে করো না অবহেলা।

যাইহোক এবার আসল কথায় আসি। এই যে একটু আগে আমি বলেছিলাম, বারো গিটের দড়ি দিয়ে লম্ব আঁকা। আসলেই পদ্ধতিটা খুব সুন্দর। এবং এই পদ্ধতিটা পিথাগোরাসের উপপাদ্য আবিষ্কৃত হওয়ারও বহু আগের থেকে মানুষ জানত। হয়ত বা সেখান থেকে পিথাগোরাস তার উপপাদ্যের ধারণা পেলেও পেয়ে থাকতে পারেন। আমরা নিশ্চিত করে আসলে বলতে পারি না।

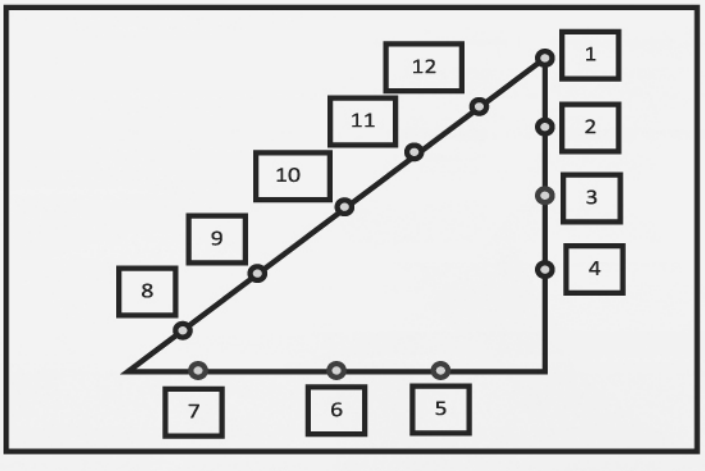

সংখ্যা ভালোবাসে বলে যাদের আমরা পাগল বলি। গণিত ভালোবাসে বলে পাগল বলি। দিনরাত জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকে বলে যাদেরকে পাগল বলি। জানেন, এ পৃথিবীতে এরকম কিছু পাগল ছিল বলেই আমাদের পৃথিবীটা এতো সুন্দর। আজকে আমরা আমাদের চারপাশে গণিতের যা কিছু দেখি, তা সম্ভব হয়েছে এরকম কিছু পাগলের জন্যই। কখনো যদি আপনি আপনার চারপাশে কোনো মানুষ দেখেন যে কোনো কিছুকে পাগলের মতো ভালোবাসে, তাকে কখনোই অশ্রদ্ধা করবেন না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, সে আপনার চেয়ে ঐ কাজে বেশি দক্ষ হবে এবং ঐ কাজটাতে আরো বেশি সাফল্য পাবে। ঐ কাজ দিয়ে সে সমাজে অনেক বড় অবদান রাখতে পারবে। আপনি যত গণিত শিখবেন, আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা তত বাড়বে। গণিত আপনাকে আস্তে আস্তে অন্যরকম মানুষে পরিণত করবে। এটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার। গণিতের কত অসাধারণ অবদান আছে সেটার বর্ণনা করতে গেলে শতাব্দী ফুরিয়ে যাবে, একটা বলি।

আপনারা অনেকেই হয়তো ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা জানেন। তিনি আলোকবর্তী নারী (Lady with the lamp) বলে পরিচিত। নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে তিনি একজন পথপ্রদর্শনকারী। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যে একজন দারুণ গণিতবিদ (পরিসংখ্যানবিদ) ছিলেন এটা কি আপনারা জানেন? ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যখন আহত সৈনিকরা তার কাছে আসত, তখন তিনি ঐ সৈনিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। সৈনিকেরা কিভাবে মারা যাচ্ছেন সেটা তিনি সম্পূর্ণ গাণিতিকভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেন। সেখান থেকে তিনি কিছু সুপারিশ করেন যে কিভাবে এ মৃত্যুহার কমানো যায়। এবং তার বিশ্লেষণের ফলে সৈনিকদের মৃত্যুহার নাকি

৪২ শতাংশ থেকে মাত্র ২ শতাংশে নেমেছিল। তাহলে বুঝুন!! আমার কাছে গণিতকে জীবনের কেনো আলাদা বিষয় মনে হয় না। মনে হয় গণিত যেন গুছিয়ে চিন্তা করার ভাষা, যেটা কাজে লাগে সব জায়গায়।

এই যে গণিত, এটা আমার ভালোবাসা। আমি যতটুকু অনুভব করতে পারি বহু প্রাচীন কাল থেকে তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ তীব্রতা দিয়ে এই ভালোবাসাটাকে অনুভব করেছেন গণিতবিদেরা। অপনারা হয়তো হাইপেশিয়ার নাম শুনে থাকবেন। হাইপেশিয়ার ছিলেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার শেষ লাইব্রেরিয়ান। একজন অসামান্য নারী ছিলেন তিনি। এই নারী গণিতবিদের জীবনের শেষ সময়টা ছিল খুব কষ্টের। ধর্মান্ধরা তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করে তার শরীরের মাংসগুলো খুবলে খুবলে তুলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ভালোবেসেছিলেন গণিতকেই। তিনি কোনোদিন বিয়েও করেননি। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো যে আপনি কেন বিয়ে করেন না? তিনি তখন বলতেন ,'কে বলেছে আমি বিয়ে করেনি, আমি তো গণিতের সাথেই আছি, আমি তো সত্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ'!! হাইপেশিয়া যেমন শেষ পর্যন্ত গণিতকেই ভালোবেসে গেছেন, তেমনি ভালোবেসেছিলেন এভারিস্ট গ্যালোয়া। তাকে বলা হয় এক রাতের গণিতবিদ। তিনি মারা গিয়েছিলেন ডুয়েল লড়তে গিয়ে। ডুয়েল মানে হলো দুজন মানুষের সামনাসামনি বন্দুকযুদ্ধ, যে হারবে সে মারা যাবে, যে বেঁচে থাকবে সে জিতবে! যার সাথে তিনি ডুয়েল লড়েছিলেন সে ছিল বন্দুকযুদ্ধে খুবই পটু। গ্যালোয়া জানতেন যে বন্দুকযুদ্ধে তিনি হেরে যাবেন এবং তিনি মারা যাবেন। এমনকি আগের রাতে তিনি যখন জানতে পারলেন যে - পরের দিন তিনি মারা যাবেন, তিনি হয়তো অনেক ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতে পারতেন। তিনি কিন্তু তা করেননি। তিনি কি করলেন জানেন? জীবনে তিনি গণিত নিয়ে যত কাজ করেছিলেন, তার সবকিছু লিখে গেলেন। একটা চিঠি লিখেছিলেন সেই রাতে। সেই চিঠিতে দেখা যায় তিনি কয়েক লাইন পরপরই লিখেছেন, 'আমার সময় ফুরিয়ে আসছে'। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে পরের দিন তিনি আর বাঁচবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তার ভালোবাসাটিকে।

এবার অপনাদেরকে কিছু নিষ্ঠুর সমস্যার কথা বলি। মনে করুন, আপনার কাছে একটা ছুরি আছে। এই ছুরিটা দিয়ে আপনি কোপ দিবেন। কোথায়? জন্মদিনের কেকে। তো জন্মদিনের কেকে তিনটা কোপ দিতে হবে। তিনটা কোপ দিয়ে সর্বোচ্চ কতগুলো টুকরো করা যায়? আমি উত্তর বলে দেই। উত্তর হচ্ছে ৮টা টুকরো করাযায়। এটা কিন্তু খুব সোজা না। সাধারণত আপনি যদি মাঝ খান দিয়ে কাটেন, মানে তিনটা কোপ দেন তাহলে ৬ টুকরো হবে। কিন্তু আমি বলেছি সর্বোচ্চ ৮টা টুকরো করা যায়। কিভবে? তা আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে!!!

এবার চিন্তা করুন আরো একটা সমস্যা। আপনার কাছে যদি তিনটা ম্যাচের কাঠি থাকে কতগুলো ত্রিভুজ বানানো যাবে? ১টা ত্রিভুজ বানানো যাবে। আসলে একটা সমবাহু ত্রিভুজ বানানো যাবে। সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে একে বলে সমবাহু ত্রিভুজ। আপনাকে যদি ৬টি ম্যাচের কাঠি দেওয়া হয় তাহলে সর্বোচ্চ কতগুলো সমবাহু ত্রিভুজ বানানো যাবে। যেগুলোর প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। ত্রিভুজগুলো সমবাহু ত্রিভুজ হতে হবে। আমি উত্তর বলে দিচ্ছি। উত্তর হবে ৪টা। কিভাবে হলো, তা আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে!!!

একবার এক মুরগির খামারের মালিক তার খামারে গিয়ে দেখে মুরগিগুলো ডিম না পেড়ে নিজেদের মধ্যে গল্প আড্ডায় মশগুল। দেখে মালিক তো রেগে আগুন,'বেয়াদব মুরগির দল, তোদেরকে কি এইজন্য এখানে রাখা হয়েছে? পরশু এসে দেখবো, যদি প্রত্যেকে এক হালি করে ডিম না দিস, সবকটাকে কেটে ঝাল ফ্রাই বানাবো'!!! দুদিন পরে সে এসে দেখছে : প্রথম মুরগি- চারটা ডিম, দ্বিতীয়টা চারটা, তৃতীয়টা চারটা, চতুর্থটা একটা!!! কী এতবড় সাহস, সবাই চারটা করে ডিম পেড়েছে তুই একটা কেন??? সে ভয়ে মিনমিন করে বললো, 'স্যার আমি তো মোরগ, ভয়ের চোটে আমিও একটা .....' বলেই সে চিৎপটাং!!!

যেজন্য গল্পটা বলা, আসলে ভয়ের চোটে অনেককিছুই হতে পারে, কিন্তু তার শেষটা ভালো হয় না। আফসোস- আমাদের লেখাপড়ার ব্যাপারটাও ভয়ের চোটে শেখার মতো। একেবারে শুরু থেকেই! আমার ছেলে ঋক কে বর্ণমালা শেখানোর জন্য ওর দীদা আদর্শলিপি বই পাঠিয়েছে-সেটাও শুরু ভয় দিয়ে- 'স্বরে অ'তে অজগরটি আসছে তেড়ে!! ওরে বাপরে - ভাবটা এমন যে ভালো করে পড়, নইলে অজগর খেয়ে ফেলবে!! আমি কি লিখতাম জানেন? 'স্বরে অ'তে অংক শিখি মজা করে। যা হোক মজা করছিলাম!!! শুরুতেই জোর করে অংক শেখাতে গেলে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কাই বেশি। তাই শেখাতে হবে আনন্দ নিয়ে।

গণিতের পথটা অপার বিস্ময়ের। এ পথে প্রতিবন্ধকতাও আছে, শুরুতে অনেককিছুই বুঝতে সমস্যা হতে পারে। মনে রাখবেন, না বোঝাটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জার কিছু নেই। আমি অনেককিছু বুঝি না, পৃথিবীর বড় বড় গনিতবিদ- বিজ্ঞানীরাও চিন্তায় ভুল করেন! কিন্তু আপনি যদি না বুঝে হাল ছেড়ে দেন, নিজেকে উল্টোপাল্টা কিছু বুঝিয়ে দেন, তখন হলো আসল পরাজয়! কৌতূহল নষ্ট হতে দেবেন না কিছুতেই- জিদ নিয়ে লেগে থাকুন, লেগেই থাকুন! হোঁচট খেলে প্রতিবার উঠে দাঁড়ান। আর সহজ মন দিয়ে ভ্রমন করতে থাকুন গণিতের রাজ্যে, জ্ঞানের ভুবনে! আগামীর পৃথিবীটা আপনার হবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস!ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার কোনো এক কিশলয়ের লেখনিতে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইংলিশ

এস কে ওমর ফারুক
সহকারি প্রধান শিক্ষক

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ আমি একটি মজার বিষয় আলোচনা করব। প্রায়শই আমাদের মাঝে ব্রিটিশ ইংলিশ ও আমেরিকান ইংলিশ নিয়ে কৌতুহল জাগে। আমাদের মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন উদয় হয়, আজ আমরা যে ইংলিশ পড়ছি সেটি কি আসলে ব্রিটিশ ইংলিশ নাকি আমেরিকান ইংলিশ? এই প্রশ্নের উত্তর খোজার জন্য চলো আমরা দেখে আসি আসলে ইংরেজির উৎপত্তি কোথা থেকে হল।

British English

Indo-European
↓
Germanic
↓
West Germanic
↓
Ingvaeonic
↓
Anglo-Frisian
↓
Anglic
↓
English
↓
British English

American English

Indo-European
↓
Germanic
↓
West Germanic
↓
Ingvaeonic
↓
Anglo-Frisian
↓
English
↓
North American English
↓
American English

সূত্র ঃ উইকিপিডিয়া

উপরের Language Family দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে British English-এর পূর্ববর্তী ধাপ হলো English যার উৎপত্তি হলো Anglic ভাষা থেকে এবং American English –এর পূর্ববর্তী ধাপ হলো North American English যার উৎপত্তি হলো English ভাষা থেকে। এগুলি ছাড়া ব্রিটিশ ইংলিশ ও আমেরিকান ইংলিশের প্রতিটি ধাপের মধ্যে মিল রয়েছে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে Anglic ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। খেয়াল করলে বুঝতে পারবে ব্রিটিশ ইংলিশ ও আমেরিকান ইংলিশ-এর Language Family Indo-European থেকে Anglo-Frisian পর্যন্ত হুবহু মিল রয়েছে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে ইংলিশ আজ আমরা পড়ছি তা ব্রিটিশ ইংলিশ ও আমেরিকান ইংলিশের সংমিশ্রন। এখন একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। কোন ইংলিশের যাত্রা আগে শুরু হয়েছিল? ব্রিটিশ ইংলিশ নাকি আমেরিকান ইংলিশ? অবশ্যই ব্রিটিশ ইংলিশ। কারণ, "আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপনে কারণে অধিকাংশ উত্তর আমেরিকানরা ইউরোপের (Great Britain) ভাষায় কথা বলে যেমন- ইংলিশ, স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ ভাষাতে।"- উইকিপিডিয়া

কিন্তু আমেরিকার স্থানীয় মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতায় আমেরিকান ইংলিশ ও ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। এবার চলো আমেরিকান ইংলিশ ও ব্রিটিশ ইংলিশের কিছু পার্থক্য দেখা যাক। আমেরিকান ইংলিশ ব্রিটিশ ইংলিশ থেকে ভিন্নতা শুধুমাত্র pronunciation-এ দেখা যায় না বরং এটির ভিন্নতা রয়েছে vocabulary, spelling ও grammar- এ।

►Pronunciation:

১. আরেরিকান ইংলিশ -এ দুটি vowel এর মধ্যে 't' অনেকটা 'd' এর মত উচ্চারিত হয়। writer এবং rider প্রায় একই রকম উচ্চারিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশ-এ এরকম পরিস্থিতিতে 't' /t/ এর মতই উচ্চারিত হয়।

২. ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের উচ্চারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্য কাজ করে সেটি হলো /r/-এর উচ্চারণ। একটি শব্দে /r/-এর অবস্থানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

(i). Initial - Such as : Right

(ii). Middle - Such as : Advertisement

(iii). Final - Such as: Door

American: আমেরিকানরা সাধারণত Initial, Middle এবং Final তিনটি /r/-কেই উচ্চারণ করে।

British : ব্রিটিশরা Initial /r/ কে উচ্চারণ করে। Middle /r/ কে উচ্চারণ করে যদি উক্ত /r/ এর সঙ্গে vowel উচ্চারিত হয়। যেমন: Forest /ফরিস্ট/। এখানে 'রি' শব্দটির শেষে 'ই' উচ্চারিত হচ্ছে যেখানে 'ই' শব্দটি vowel প্রকাশ করে। কিন্তু Middle /r/ এর সঙ্গে vowel উচ্চারিত না হলে /r/ উচ্চারিত হবে না।

যেমন: Foresee /ফো'সী/। এখানে /r/ এর পরে /s/ উচ্চারিত হচ্ছে অর্থাৎ consonant প্রকাশ করছে।

Exception: Parents।

ব্রিটিশরা সাধারণত Final /r/ কে উচ্চারণ করে না। যেমন: sister /সিসটা'/

কিন্তু Final /r/ এর পরে যদি কোন শব্দ থাকে এবং উক্ত শব্দের প্রথমে যদি vowel থাকে তাহলে Final /r/ উচ্চারিত হবে।

যেমন: Later on.

►Spelling

(i). যে সমস্ত শব্দ বানান করে লেখার সময় উক্ত শব্দের শেষে 'tre' লেখা হয় সেখানে আমেরিকানরা 'ter' লিখে থাকে।

যেমন : Centre (British); Center (American)

(ii). যে সমস্ত শব্দ বানান করে লেখার সময় উক্ত শব্দের শেষে 'our' লেখা হয় সেখানে আমেরিকানরা 'or' লিখে থাকে।

যেমন : Colour (British), Color (American)

(iii). যে সমস্ত শব্দ বানান করে লেখার সময় উক্ত শব্দের শেষে 'ogue' লেখা হয় সেখানে আমেরিকানরা 'og' লিখে থাকে।

যেমন: Dialogue (British), Dialog (American)

(iv). অনেক verb আছে যে verb এর শেষে যেখানে ব্রিটিশরা 'ize' অথবা 'ise' লিখে থাকে সেখানে আমেরিকানরা শুধুমাত্র 'ize' লিখে থাকে।

যেমন: Realize/ Realise (British), Realize (American)

►Grammar

(i). Present Perfect/ Simple Past Tense

আমেরিকানরা Past Indefinite Tense এ Already, Just, Yet প্রভৃতি লিখে থাকে যেখানে ব্রিটিশরা এগুলি Present Perfect Tense এ ব্যবহার করে।

যেমন: I have just seen her. (British), I just saw her. (American)

(ii). Get

আমেরিকানরা ইংলিশে 'Get' এর Past Participle Form হিসেবে 'Gotten' ব্যবহার করে। যেখানে ব্রিটিশ ইংলিশে 'Gotten' এর স্থলে 'Got' ব্যবহৃত হয়।

যেমন: Your English has got better. (British), Your English has gotten better. (American)

(iii). Shall

আমেরিকানরা সাধারণত Future Tense এ First Person Singular Number এর পরে Shall ব্যবহার করে না। তারা 'Will' ব্যবহার করে। যেখানে ব্রিটিশরা Shall/ Will ব্যবহার করে।

যেমন: I shall/ will be here tomorrow. (British), I will be here tomorrow. (American)

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অতি সংক্ষেপে আমি তোমাদের ব্রিটিশ ইংলিশ ও আমেরিকান ইংলিশ-এর কিছু পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ব্রিটিশ ইংলিশ ও আমেরিকান ইংলিশ-এর সংমিশ্রণে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ভালো ইংলিশ জানতে হলে তোমাকে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণ ইংরেজি অধ্যায়ন করতে হবে। তোমাকে Phonetics সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। আরো অধ্যায়ন করবে Homograph, Homophone এবং Homonym সম্পর্কে। প্রচুর পরিমাণ Vocabulary সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক এই ভাষাটি সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকুক অটুট। এই শুভকামনায় আজ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ধাঁধা

১) তিন অক্ষরে নাম তার সবার ঘরে রয় মাঝের অক্ষর বাদ দিলে বাদ্যযন্ত্র হয় ।প্রথম অক্ষর বাদ দিলে খাবার যোগ্য হয়?
উত্তরঃ বিছানা।

২) দিনের বেলা ঘুমিয়ে থাকে রাতের বেলায় জাগে, ঘর নেই বাড়ি নেই আকাশেতে থাকে?
উত্তরঃ চাঁদ।

৩) তিন বর্ণের নাম আমার বিদ্যার সাথী, মাথাটা কেটে দিলে হই মাপকাঠি?
উত্তরঃ কাগজ

৪) কোন দেশে মাটি নেই?
উত্তর : সন্দেশ।

৫) পৃথিবীর কোন দেশে তুমি গেলে তোমাকে কেউ খুঁজে পাবে না?
উত্তরঃ নিরুদ্দেশে।

৬) একটা মুরগী ভারত ও বাংলাদেশের বর্ডারে ডিম পাড়লে ডিমটা কার হবে?
উত্তর ডিমটা হবে মুরগীর।

৭) সে ঘোরে কিন্তু ঘোরে না জিনিসটা কী?
উত্তরঃ মাথা

৮) কোন ফুল ফোটে না তবু তাকে আমরা খুব সুন্দর ফুল বলে থাকি?
উত্তরঃ বিউটিফুল

৯) কোন জিনিস ডোবে কিন্তু ভেজেনা?
উত্তরঃ সূর্য।

১০) কী খেলে পেট ভরে না?
উত্তরঃ মার খেলে।

১১) কাটলে সকল বস্তু ছোট হয়ে যায় এমন কী আছে যা কাটলে বড় হয়ে যায়?
উত্তরঃ চুল।

নুসরাত জাহান আলভি
নবম শ্রেণি

১. এমন কোনো জিনিস আছে যেটা গরমকাল বা শীতকাল সবসময় ঠান্ডা থাকে?
উত্তরঃ বরফ।

২. কোন জিনিসের পা নেই কিন্তু সে খুব জোরে হাঁটে, একবার সে চলে গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসেনা?
উত্তরঃ সময়।

৩. তিন অক্ষরে নাম তার মাটির তলায় থাকে মাঝের অক্ষর বাদ দিলে গাছে ঝুলে থাকে?
উত্তরঃ কয়লা।

৪. দুই অক্ষরে নাম তার বহুলোকে খায় শেষের অক্ষর বাদ দিলে হেঁটে চলে যায়?
উত্তরঃ পান।

৫. কী সবসময় তোমার সামনে থাকে কিন্তু তুমি দেখতে পাওনা?
উত্তরঃ ভবিষ্যৎ।

হাইফা আফরিন
শ্রেণিঃ পঞ্চম

১। অন্ধ বাগান
বন্ধু গাছ
ফুল ফোটে কিন্তুবারো মাস।
উঃ আকাশ ও তারা।

২। আমি তুমি একজন
দেখতে একই রূপ
আমি কত কথা বলি
তুমি কেন চুপ?
উঃ আয়না।

৩। কাঁচাতে তুলতুলে
পাঁকাতে টক
জিভে আসে জল
বল কোন ফল?
উঃ তেঁতুল।

৪। গাছ নেই আছে পাতা
মুখ নেই বলে কথা।
উঃ বই

অথৈ দাস
শ্রেণিঃ নবম

১। এমন তিনটি সংখ্যা বলতো যাদের যোগফল ও গুণফল একই হবে?
উঃ ১, ২, ৩।

২। কোন খানা শুধু দেখা যায় কিন্তু খাওয়া যায় না?
উঃ চিড়িয়াখানা।

৩। কোন জিনিস বেশি হলে আর কমে না?
উঃ বয়স।

৪। কোন জিনিস গরম নয় কিন্তু সবাই গরম বলে?
উঃ গরম মসলা।

৫। কোন বুক পড়লে স্কুলে যেতে হয় না?
উঃ ফেসবুক

বিদ্যালয়ের অর্জন

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণ

বিদ্যালয়ের অর্জন

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণ

ট্যালেন্টপুল বৃত্তিপ্রাপ্ত

আদ্রিতা মণ্ডল

পূজা রায়

সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত

হাবিবা সুলতানা

মো: তানভির হোসেন

স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি

কৃষিশিক্ষা প্র্যাক্টিকাল

ক্লাস পার্টি

নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম

নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম

শিক্ষক দিবস

ভর্তি চলিতেছে !

ভর্তি চলিতেছে !!

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্লে-গ্রুপ হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত

সিএসএস পরিচালিত

রেভারেন্ড পল্‌স হাই স্কুল, গল্লামারী, খুলনা।

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক পাঠদান
- নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ
- পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি শিক্ষার্থীদের বিশেষ পাঠদান
- শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ
- বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন
- চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন
- ছোট্ট সোনামণিদের বিনোদনের জন্য মিনি শিশু পার্ক
- খেলাধুলার জন্য প্রশস্ত মাঠ
- অভিভাবক-শিক্ষক মতবিনিময় সভা ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা
- ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা
- ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ধর্মের মেয়েদের আবাসিকের সুব্যবস্থা
- বিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শ্রেণিকক্ষ সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
- বিদ্যালয়ে সুনিয়ন্ত্রিত আইন-শৃঙ্খলা, শালীনতা ও শিষ্টাচার অনুশীলন
- বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে সার্বক্ষণিক জেনারেটরের ব্যবস্থা
- বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহণ (স্কুল বাস) ব্যবস্থা
- বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ক্যান্টিনের সুব্যবস্থা

আপনার সন্তানকে ভর্তির জন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান

শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা

মুদ্রণ : সিএসএস প্রিন্টিং প্রেস, ৮৭, এম. এ. বারী রোড, খুলনা।